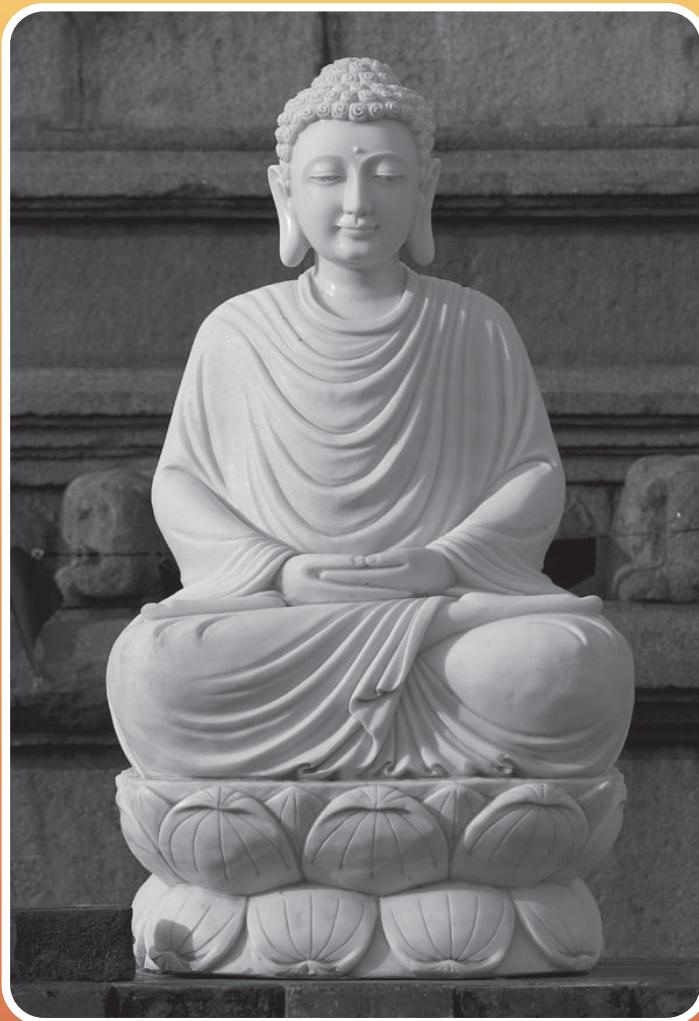


বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

ষষ্ঠ শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
ষষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা ষষ্ঠ শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম সংস্করণ রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া

ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া

গীতাঞ্জলি বড়ুয়া

ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া

উত্তরা চৌধুরী

প্রথম প্রকাশ	:	সেপ্টেম্বর ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ	:	সেপ্টেম্বর ২০১৪
পরিমার্জিত সংস্করণ	:	অক্টোবর ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ কথা

বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উপযোগ বহুমাত্রিক। শুধু জ্ঞান পরিবেশন নয়, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ জাতিগঠন এই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। একই সাথে মানবিক ও বিজ্ঞানমনোক সমাজগঠন নিশ্চিত করার প্রধান অবলম্বনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা। বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াতে হলে আমাদের মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ ও নৈতিকতার শক্তিতে উজ্জীবিত করে তোলা ও জরুরি।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রাণ শিক্ষাক্রম। আর শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পাঠ্যবই। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর উদ্দেশ্যসমূহ সামনে রেখে গৃহীত হয়েছে একটি লঞ্চ্যার্ভিসারী শিক্ষাক্রম। এর আলোকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) মানসম্পন্ন পাঠ্যপুস্তক প্রয়োন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে যাচ্ছে। সময়ের চাহিদা ও বাস্তবতার আলোকে শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক ও মূল্যায়নপদ্ধতির পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিশোধনের কাজটি এই প্রতিষ্ঠান করে থাকে।

বাংলাদেশের শিক্ষার স্তরবিন্যাসে মাধ্যমিক স্তরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বইটি এই স্তরের শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসপ্রবণতা ও কৌতুহলের সাথে সংগতিপূর্ণ এবং একইসাথে শিক্ষাক্রমের লঙ্ঘ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সহায়ক। বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ বইটি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। আশা করি বইটি বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান পরিবেশনের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের মনন ও সৃজনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

জাতীয় শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকটি শ্রেণি উপযোগী বিষয়বস্তু ও তথ্যে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের শিখনে আগ্রহী ও জানার ফেরেকে বাস্তবযুক্তি করে তুলতে পাঠ্যপুস্তকটিতে বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট চিত্র, কাজ ও অনুশীলনী সহিতে করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটি অধ্যয়নে শিক্ষার্থীরা ধর্ম ও নৈতিকতার আদর্শে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হবে। এর মাধ্যমে তারা গৌতম বুদ্ধের অহিংসা, মৈত্রী, করণা, নৈতিক ও সৎ জীবনের উপায়, বৌদ্ধ ধর্মদর্শন, সংকৃতি ও গ্রন্থিত্ব সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে তাদের জীবনকে সুন্দর ও কল্যাণকর করে তুলতে পারবে। আশা করা যায়, এই পুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় নীতিবোধসম্পন্ন জীবন গড়তে যেমন সমর্থ হবে তেমনি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হবে এবং একইসাথে সর্বজনীন কল্যাণবোধ, দেশপ্রেম ও সহনশীলতার চেতনায়ও অনুপ্রাণিত হবে।

পাঠ্যবই যাতে জবরদস্তিমূলক ও ক্লান্তিকর অনুষঙ্গ না হয়ে উঠে বরং আনন্দশীল হয়ে উঠে, বইটি রচনার সময় সেদিকে সর্তক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। সর্বশেষ তথ্য-উপাত্ত সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। চেষ্টা করা হয়েছে বইটিকে যথাসম্ভব দুর্বোধ্যতামূলক ও সাবলীল ভাষায় লিখতে। ২০২৪ সালের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রয়োজনের নিরিখে পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিমার্জন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ২০১২ সালের শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের সর্বশেষ সংস্করণকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বানানের ফেরে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানানরীতি অনুসৃত হয়েছে। যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনের পরেও তথ্য-উপাত্ত ও ভাষাগত কিছু ভুলক্রটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। পরবর্তী সংস্করণে বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার আন্তরিক প্রয়াস থাকবে। এই বইয়ের মানোন্নয়নে যে কোনো ধরনের যৌক্তিক পরামর্শ কৃতজ্ঞতার সাথে গৃহীত হবে।

পরিশেষে বইটি রচনা, সম্পাদনা ও অলংকরণে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের স্বার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

অক্টোবর ২০২৪

প্রফেসর ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	গৌতম বুদ্ধের জীবন্মে	১-১৩
দ্বিতীয়	বন্দনা	১৪-২২
তৃতীয়	শীল	২৩-২৯
চতুর্থ	দান	৩০-৩৭
পঞ্চম	সূত্র ও নীতিগাথা	৩৮-৫০
ষষ্ঠি	চতুর্বার্য সত্য	৫১-৫৬
সপ্তম	ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব	৫৭-৬৮
অষ্টম	চরিতমালা	৬৯-৮১
নবম	জাতক	৮২-৯২
দশম	বাহ্যাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান	৯৩-১০৩
একাদশ	বৌদ্ধধর্মে রাজন্যবর্গের অবদান : রাজা বিদ্যুসার	১০৪-১০৮

প্রথম অধ্যায়

গৌতম বুদ্ধের জীবন্তেম

আজ থেকে আড়াই হাজার বছরেরও আগে গৌতম বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক। তাঁর ধর্মের অনুসারীদের বৌদ্ধ বলা হয়। আমরা বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। গৌতম বুদ্ধের বাল্য নাম ছিল সিদ্ধার্থ গৌতম। বুদ্ধত্ব লাভ করে তিনি গৌতম বুদ্ধ নামে খ্যাত হন। ছোটবেলা থেকেই জীবের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম মমত্ববোধ। ছোট-বড় সকল প্রাণীকে তিনি সমানভাবে ভালোবাসতেন। তাঁর সেবায় ও আদরে অনেক প্রাণী সুস্থ হয়েছে এবং মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। ত্রিপিটকের গ্রন্থসমূহে গৌতম বুদ্ধের জীবন্তেমের অনেক কাহিনি পাওয়া যায়। এ অধ্যায়ে আমরা গৌতম বুদ্ধের জীবন্তেম সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা —

* বুদ্ধের জীবন্তেম ব্যাখ্যা করতে পারব।

* গৌতম বুদ্ধের জীবন্তেমের কাহিনি বর্ণনা করতে পারব।

পাঠ : ১

গৌতম বুদ্ধের পরিচিতি

খ্রিস্টপূর্ব ৬২৩ অন্দে সিদ্ধার্থ গৌতম কপিলাবস্তুর লুম্বিনী কাননে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শুন্দেশন এবং মাতার নাম মহামায়া। তাঁরা শাক্য রাজের রাজা এবং রানি ছিলেন। সিদ্ধার্থের জন্মের সাত দিন পর মাতা রানি মহামায়া মৃত্যুবরণ করেন। তারপর সিদ্ধার্থের লালন-পালনের দায়িত্ব নেন রানি মহাপ্রজাপতি গৌতমী। তিনি রানি মহামায়ার বোন ছিলেন। বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী কর্তৃক লালিত-পালিত হয়েছিলেন বলে সিদ্ধার্থের অপর নাম হয় গৌতম। শাক্যরাজ বৎশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে তিনি শাক্যসিংহ নামেও পরিচিত।

সিদ্ধার্থের জন্মের খবর শুনে অনেক জ্যোতিষী রাজপ্রাসাদে আগমন করেন। তাঁরা শিশু সিদ্ধার্থের মধ্যে বত্রিশটি সুলক্ষণ দেখতে পান এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন, ‘এই রাজকুমার গৃহে থাকলে রাজচক্রবর্তী রাজা হবেন, সন্ন্যাস জীবন ধারণ করলে মহাজ্ঞানী বুদ্ধ হবেন।’ কিন্তু একমাত্র ঝুঁঁ অসিত বলেন, রাজকুমার মহাজ্ঞানী বুদ্ধ হবেন।

রানি মহাপ্রজাপতি গৌতমী এবং রাজা শুন্দেশনের অপরিসীম স্নেহ-মমতায় সিদ্ধার্থ ক্রমে বড় হয়ে উঠতে থাকেন। রাজা রাজকুমারের শিক্ষার জন্য বহু শাস্ত্রবিদ পদ্ধিত নিয়োগ করেন। তিনি এদের নিকট নানা শিল্পবিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করেন। ক্রমে তিনি ঘোড়ায় চড়া, রথচালনা, অসি-চালনা, যুদ্ধকৌশল এবং অন্যান্য বিদ্যা শেখেন। রাজকুমারের বুদ্ধি, মেধা ও সূতিশক্তি দেখে গুরু বিশ্মিত হন। অল্প দিনের মধ্যে রাজকুমার সকল শাস্ত্র ও শিল্পকলায় পারদর্শিতা লাভ করেন।

রাজকীয় পরিবেশে রাজকুমার ক্রমে কৈশোরে উন্নীর্ণ হন। কিন্তু কিশোর বয়স থেকেই রাজকীয় ভোগ-বিলাসে তিনি উদাসীন ছিলেন। প্রায়ই তাঁকে একাকী নির্জনে ধ্যানমগ্ন থাকতে দেখা যেত। রাজকুমারের বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা -৬ষ্ঠ, ফর্মা নং-১

ভোগ-বিলাসের প্রতি উদাসীনতা দেখে রাজা শুমেধোদন চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং জ্যোতিষীদের ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করে অস্বস্তিতে দিনাতিপাত করতে থাকেন। ক্রমে রাজকুমার সিদ্ধার্থ যৌবনে পদার্পণ করেন। কিন্তু রাজা লক্ষ্য করলেন, যতই দিন যাচ্ছে কুমার ততই উদাসীন হয়ে যাচ্ছেন। তিনি রাজকুমারকে ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত রাখার জন্য সকল প্রকার আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু কোনো কিছুই রাজকুমারকে আকৃষ্ট করতে পারল না। অবশ্যে রাজা অমাত্যদের (মন্ত্রী) সঙ্গে পরামর্শ করেন। অমাত্যগণ রাজকুমারকে সৎসারামুখী করার জন্য বিবাহবন্ধনে আবন্ধ করার পরামর্শ দেন। সপ্তহব্যাপী ঝঁকজমকপূর্ণ উৎসবের মধ্য দিয়ে যশোধরার সঙ্গে সিদ্ধার্থ বিবাহবন্ধনে আবন্ধ হন। যশোধরা গোপাদেবী নামেও পরিচিত ছিলেন।

বাল্যকাল হতে সিদ্ধার্থের মনে যে বৈরাগ্যের সংগ্রাম হয়, যৌবনে এসে তা আরো বৃদ্ধি পায়। রাজ-অলতঃপুরের ভোগ-বিলাসের মধ্যেও সিদ্ধার্থের মনে শান্তি ছিল না। একদা তাঁর নগরভ্রমণের বাসনা হলো। রাজা ঘোষণা করে দিলেন, রাজকুমার নগরভ্রমণে যাবেন, পথ-ঘাট সব যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়। নির্দেশ দিলেন, কোনো অসুস্থির দৃশ্য যেন রাজকুমারের দৃষ্টির মধ্যে না পড়ে। রাজার আদেশে রাজপথ পরিচ্ছন্ন ও সজ্জিত করা হলো। রাজকুমার নগর ভ্রমণে বের হলেন। সাজসজ্জা দেখে রাজকুমারের প্রথম মনে হলো জগতে দুঃখ, বেদনা, হতাশা নেই। কিছুদূর যাওয়ার পর রাজকুমার দেখলেন, এক জরাজীর্ণ দুর্বল বৃক্ষ বৃক্ষদেহে লাঠিতে ভর দিয়ে অতিকফ্টে পথ চলছে। সিদ্ধার্থ রথচালক ছন্দককে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ও কে?’ ছন্দক বললেন, ‘এক বৃক্ষ।’ সিদ্ধার্থ বললেন, ‘সকলেই কি বৃক্ষ হবে, আমরাও?’

উত্তরে তিনি বললেন, ‘সকলেই বৃক্ষ হবে। এটাই জগতের নিয়ম।’ ছন্দকের কথা শুনে বিষণ্ণ মনে সিদ্ধার্থ রাজপ্রাসাদে ফিরে যান।

পরদিন আবার নগরভ্রমণে বের হন। দ্বিতীয় দিন দেখতে পেলেন, ব্যাধিগ্রস্ত এক লোক যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। সিদ্ধার্থ ছন্দকের নিকট কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘এই লোক ব্যাধিগ্রস্ত, সৎসারের যে কেউ যে কোনো সময় এ রকম রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে পারে।’ সিদ্ধার্থ বিষণ্ণ মনে রাজপ্রাসাদে ফিরে যান।

তৃতীয় দিন সিদ্ধার্থ আবার নগরভ্রমণে বের হলেন। দেখলেন, চারজন লোক একটি মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। পিছনে একদল লোক ত্রন্দল ও বিলাপ করছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করলে ছন্দক বলেন, ‘জন্মগ্রহণ করলে মৃত্যুবরণ করতে হয়। সকলেই মৃত্যুর অধীন। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু মানুষের অবশ্যজ্ঞাবী পরিণতি।’ সিদ্ধার্থ বিষণ্ণ মনে পুনরায় রাজপ্রাসাদে ফিরে যান।

চতুর্থ দিন রাজকুমার পুনরায় নগর ভ্রমণে বের হলেন। দেখলেন শান্ত, সৌম্য, গেরুয়া বসনধারী মুণ্ডিত মস্তক এক সন্ন্যাসী ধীরগতিতে পথ চলেছেন। পরিচয় জানতে চাইলে ছন্দক বলেন, ‘ইনি সৎসার ত্যাগী বন্ধনহীন এক মুক্ত পুরুষ। ভোগ-বিলাস বিসর্জন দিয়ে শান্তি অন্঵েষণ করছেন।’ ছন্দকের কথা শুনে সিদ্ধার্থ খুশি হন এবং গৃহত্যাগের সংকল করে রাজপ্রাসাদে ফিরে যান।



সিদ্ধার্থের চারি নিমিত্ত দর্শন

সিদ্ধার্থ যখন সংসার ত্যাগের চিন্তায় অস্থির, তখন খবর এল তাঁর এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। খবর শুনে তিনি বিচলিত হয়ে বললেন, ‘রাহুল জন্মেছে, বন্ধন জন্মেছে।’ তাই পুত্রের নাম রাখা হলো রাহুল। পুত্রের জন্মসংবাদ শুনে সিদ্ধার্থ দৃঢ় সংকষ্ট করলেন, ‘আমি আর কালবিলম্ব না করে সকল বন্ধন ছিন্ন করে



নিরামগ্ন গোপাদেবী ও পুত্র রাহুলকে সিদ্ধার্থের শেষ দর্শন

শীত্রাই বেরিয়ে পড়ব।' ক্রমে সিদ্ধার্থ ২৯ বছর বয়সে উপনীত হন। সেদিন ছিল আয়াটী পূর্ণিমা। রাজ-অন্তঃপুরের সবাই গভীর নিদায় মগ্ন। সিদ্ধার্থ বিদায়কালে গোপাদেবী ও প্রাণপ্রিয় পুত্রকে শেষবারের মতো দেখার জন্য গোপার কক্ষে প্রবেশ করলেন। দেখলেন, গোপা শিশুপুত্রকে বুকে জড়িয়ে গভীর নিরামগ্ন। একবার ইচ্ছা হলো শিশুটিকে কোলে নিয়ে আদর করবেন। পরক্ষণে ভাবলেন, কোলে তুলে নিলে মা জেগে উঠবেন, তাহলে তাঁর যাওয়াই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আসাসংবরণ করে তিনি গোপার কক্ষ থেকে বের হয়ে আসেন।

অতঃপর রাখচালক ছন্দককে নির্দেশ দিলেন অশ্ব কল্পককে প্রস্তুত করে নিয়ে আসতে। ছন্দক কল্পককে নিয়ে এলে উভয়ে অশ্বপৃষ্ঠে চড়ে গৃহত্যাগ করলেন। বৌদ্ধ পরিভাষায় সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগকে ‘মহাভিন্নক্রমণ’ বলা হয়। অনোমা নদী পার হয়ে সিদ্ধার্থ ছন্দককে বললেন, ‘তুমি কল্পককে নিয়ে ফিরে যাও।’ ছন্দক গৌতমকে খুব ভালোবাসতেন। তাঁর মন কষ্টে বাধিত হয়ে উঠল। প্রিয় অশ্ব কল্পক শোকে সেখানেই মৃত্যুবরণ করল। সিদ্ধার্থ পায়ে হেঁটে বৈশালী নগরে পৌছলেন। ঋষি আলার কালাম, রামপুত্র রূদ্রকের কাছে যোগ, ধ্যান ইত্যাদি শিক্ষা প্রাপ্ত করলেন। তাতে তাঁর মন তৃপ্ত হলো না। সেখান থেকে গেলেন রাজগংহে। রাজগংহ থেকে উরুবেগার সেনানী গ্রামে। গ্রামটি নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। এখানে অশ্বথ গাছের নিচে শুরু করেন কঠোর ধ্যান-সাধনা। ছয় বছর কঠল তাঁর ধ্যান-সাধনায়। অবশেষে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে



বুদ্ধ পঞ্চবঙ্গীয় শিষ্যকে ধর্ম প্রচার করছেন

লাভ করেন বুদ্ধত্ব, জগতে তিনি খ্যাত হন বুদ্ধ নামে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল পঁয়াত্রিশ বছর। বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি সারনাথের খায়িপতন মৃগদাবে পঞ্চবঙ্গীয় শিষ্যদের নিকট প্রথম ধর্মপ্রচার করেন, যা ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র নামে অভিহিত। সকল প্রাণীর দুঃখমুক্তি এবং মঙ্গলের জন্য তিনি সুদীর্ঘ প্রায় পঁয়তাঙ্গিশ বছর তাঁর অমৃতময় ধর্মবাণী প্রচার করেন এবং আশি বছর বয়সে কুশিনারার শালবনে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

চারি নিমিত্ত কী কী?

পাঠ : ২

গৌতম বুদ্ধ ও জীবপ্রেম

বৌদ্ধধর্মে জীবপ্রেমকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। গৌতম বুদ্ধের জীবন জীবপ্রেমে সিন্ত। শুধু মানুষ নয়, ছেট-বড় সকল জীবের প্রতি বুদ্ধের অপরিসীম মমত্ববোধ ছিল। ‘সকল প্রাণী সুখী হোক’— বৌদ্ধদের অন্যতম কামনা। বুদ্ধের প্রতিটি ধর্মবাণীতে রয়েছে জীবপ্রেমের অমিয় আহ্বান। সকল বৌদ্ধকে পঞ্চশীল গ্রহণ করতে হয়। পঞ্চশীলের প্রথম শীলটি হচ্ছে — প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকব, এই শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি। এই শীলের মধ্যে শুধু প্রাণীর প্রতি গভীর মমত্ববোধই প্রকাশিত হয়নি, অধিকতু ছেট-বড় সকল প্রাণীকে রক্ষা করার প্রেরণাও রয়েছে। তাই বাধ, হরিগ, হাতিসহ বনের কোনো প্রাণীই শিকার বা হত্যা করা উচিত নয়। বুদ্ধের জীবপ্রেমের একটি কাহিনি নিচে তুলে ধরা হলো।

সিদ্ধার্থ ও রাজহাস

বুদ্ধের বাল্যজীবনের ঘটনা। একদিন সিদ্ধার্থ পুষ্প উদ্যানে একাকী বসে ছিলেন। এমন সময় সাদা মেঘবন্ধের মতো একরোক রাজহাস পরম আনন্দে আকাশে উড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটি রাজহাস তিরবিদ্ধ হয়ে আহত অবস্থায় তাঁর সামনে পতিত হয়। শরাহত রাজহাসটি মৃত্যুবন্ধনায় ছটফট করছিল। সিদ্ধার্থ পরম যত্নে রাজহাসটিকে কোলে তুলে নিলেন। রাজহাসটির শরীর থেকে শর বের করলেন, ক্ষতস্থানে প্রলেপ লাগিয়ে পরম মমতায় সেবা-সুশূর্যা করে রাজহাসটিকে সুস্থ করে তুললেন। পরম সুস্থে রাজহাসটির দুচোখ দিয়ে অশু নির্গত হলো এবং সিদ্ধার্থের দিকে কৃতজ্ঞত্বে তাকিয়ে রইল। এমন সময় বুদ্ধের জ্ঞাতি আতা দেবদণ্ড সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন,

‘শরবিদ্ধ রাজহাসটি আমার। আমিই তির নিষ্কেপ করে রাজহাসটিকে ভূমিতে পতিত করেছি। আমার হাস আমাকে দাও।’

তখন মমতায় ভরা কঢ়ে সিদ্ধার্থ বললেন,

‘তাই দেবদণ্ড! যে প্রাণরক্ষা করে প্রাণীর উপর তারই অধিকার। যে প্রাণ হননে উদ্যত হয়, প্রাণীর উপর তার অধিকার ধাকতে পারে না। হাসটি মৃত নয়, আহত মাত্র। আমিই সেবা দিয়ে সুস্থ করে হাসটির জীবনরক্ষা করেছি। তাই হাসটি আমার। আমি এই শাক্যরাজ্য তোমাকে দিতে পারি, কিন্তু হাসটি দিতে পারব না।’

এরূপ বলে সিদ্ধার্থ হাসটি আকাশে উড়িয়ে দিলেন।



শ্রাহত রাজহাসকে কুমার সিদ্ধার্থের সেবা

অনুশীলনমূলক কাজ

আহত রাজহংসটি কার? তোমার মতামত দাও।

পাঠ : ৩

বুদ্ধের মৈত্রী প্রদর্শন

পাণি ‘মেত্তা’ শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে মৈত্রী; যার সমার্থক শব্দ হচ্ছে মিত্রতা, বন্ধুত্ব, প্রেম, ভালোবাসা, হিতচিন্তা, পরোপকারিতা, শুভেচ্ছা, সৌহার্দ্য, সৌজন্যবোধ ইত্যাদি। মৈত্রী মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি বা সংস্কার। এটি হিংসা-বিদ্যের বিপরীত দিক। হিংসা-বিদ্যে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও ঘৃণার জন্ম দেয়। মনের মধ্যে হিংসার দাবানল জুলে। এতে মানুষের মন হিংসা পশুর চেয়েও ভয়ংকর হয়। ফলে সে যেকোনো অন্যায়-অবিচার ও প্রাণী হত্যার মতো খারাপ কাজ করতেও বিধাবোধ করে না। মৈত্রী মানুষের মনকে উদার, শান্ত ও দৰ্শামুক্ত রাখে। মৈত্রী মন থেকে ক্রোধ, হিংসা, হীন প্রবৃত্তি দূরীভূত করে এবং অপরের প্রতি প্রেম, ভালোবাসা ও মমত্ববোধ জাগ্রত করে। বুদ্ধ বলেছেন, ‘মৈত্রী দ্বারা ক্রোধকে জয় করবে, সাধুতা দ্বারা অসাধুতাকে জয় করবে, ত্যাগ দ্বারা কৃপণকে জয় করবে এবং সত্ত্বের দ্বারা মিথ্যাবাদীকে জয় করবে।’ বুদ্ধ আরো বলেছেন, ‘মা যেমন তাঁর একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করেন, তেমনি সকল

প্রাণীর প্রতি মৈত্রী পোষণ করবে।' নিম্নে বুদ্ধের মৈত্রী প্রদর্শনের একটি কাহিনি তুলে ধরা হচ্ছে।

সিদ্ধার্থ গৌতম ও ছাগশিশু

গৃহত্যাগের পর একদিন সিদ্ধার্থ গৌতম রাজগহ থেকে বৈশালী যাচ্ছিলেন। পথের মধ্যে এক ছাগশিশুর করুণ কান্না তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এ সময় তিনি ছাগশিশুটি কোগে তুলে নিয়ে রাখালকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এদেরকে নিয়ে তুমি কোথায় যাচ্ছ?' রাখাল বলল,

'এগুলো রাজপ্রাসাদে নিয়ে যাচ্ছ। সেখানে এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানে হাজার হাজার ছাগশিশু বলি দেওয়া হবে।'

পুত্রসন্তান কাননায় রাজা বিস্মিসার এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন। তিনি তেরি বাজিয়ে ঘোষণা করেন যে, রাজ্যে যত ছাগশিশু আছে, সেগুলো যেন রাজপ্রাসাদে আনা হয়। রাখালের মুখে এ কথা শুনে শ্রমণ গৌতম যজ্ঞ অনুষ্ঠানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। কারণ, এতগুলো অবোধ প্রাণীর রক্তে প্রাপ্তি হবে যজ্ঞভূমি। তিনি তা মেনে নিতে পারেননি। রাজপ্রাসাদের সামনে একটি মন্দির। সেই মন্দিরের সামনে এই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পুরোহিতরা মন্ত্র পাঠ করছিলেন। ছাগশিশুর করুণ কান্নায় তাঁদের মন্ত্র উচ্চারণের শব্দ চাপা পড়ে যায়। এ অবস্থায় কোগে ছাগশিশু নিয়ে মহাযজ্ঞস্থলে সিদ্ধার্থ গৌতম প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে রাজা আনন্দিত হলেন। রাজা বললেন,

'আমার কী সৌভাগ্য যে আমার অনুষ্ঠানে নবীন সন্ম্যাসীও অংশগ্রহণ করছেন।'

সিদ্ধার্থ গৌতম চারদিকে একগুলক তাকিয়ে রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, আপনার নিকট আমার একটি প্রার্থনা আছে।' তখন রাজা বললেন, 'আপনার প্রার্থনা আমাকে বলুন। আমি আপনার প্রার্থনা পূরণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

সিদ্ধার্থ গৌতম তখন বললেন, 'আমি ছাগশিশুর প্রাগভিক্ষা চাই।' রাজা বললেন, 'পুত্র লাভের আশায় আমি ধর্মীয় বিধান অনুসারে মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছি। এখানে সহস্র ছাগশিশু বলি দেওয়া হবে। আপনি আমার যজ্ঞ নষ্ট করবেন না।' সিদ্ধার্থ গৌতম বললেন, 'মহারাজ, আমি আপনার যজ্ঞ নষ্ট করতে চাই না। বিনা রক্তে যদি আপনার দেবতা তুষ্ট না হন তবে এ ছাগশিশুর পরিবর্তে আমাকে বলি দিন। এতে আপনার নরহত্যাজনিত পাপ হবে না। কারণ, আমি বেছায় আত্মাদান করছি।' গৌতম পুনরায় রাজা বিস্মিসারকে বললেন, 'মহারাজ শুনুন, ওই ছাগশিশুর কান্না। পশুর পরিবর্তে মানুষ পেলে আপনার দেবতা আরো বেশি তুষ্ট হবেন। সুতরাং আমাকে বলি দিন। এতে যজ্ঞও হবে, ছাগশিশুরাও জীবন ফিরে পাবে।' এ কথা বলে শ্রমণ গৌতম ঘৃপকাষ্ঠে বন্দী ছাগশিশুকে মুক্ত করে দিলেন এবং নিজেকে বলি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।



সিন্ধার্থের জীবনের বিনিময়ে ছাগশিশুর মুক্তি কামনা।

এ দৃশ্য দেখে সবাই নিষ্ঠুর হয়ে গেল। পুরোহিতরা মন্ত্রপাঠ বন্ধ করে দিলেন। তখন রাজা বিশ্বসারের মনে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। রাজা বললেন,

‘হে জ্ঞানতাপস! অহঙ্কার ও আভিজ্ঞাত্যে আমার দৃষ্টিভ্রম হয়েছিল। আপনি আজ আমাকে সত্যের পথ দেখালেন। আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।’

এ বলে রাজা সকল ছাগশিশু ছেড়ে দিতে এবং যজ্ঞ বন্দের আদেশ দিলেন। শুধু তা-ই নয়, তখন থেকে রাজা বিশ্বসার তাঁর রাজ্যে চিরদিনের জন্য পশুবলি বন্ধ করার নির্দেশ দেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

ছাগশিশুগুলো কীভাবে জীবন ফিরে পেল?

পাঠ : ৪

গৌতম বুদ্ধ ও অহিংসা নীতি

বুদ্ধ অহিংসবাদী ছিলেন। তাই বৌদ্ধধর্মকে অহিংসার ধর্ম বলা হয়। অহিংসা শব্দের সাধারণ অর্থ হলো হিংসা না করা। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে ‘অহিংসা’ শব্দটির বিভিন্ন রকম অর্থ রয়েছে। বৌদ্ধধর্মতে অহিংসা শব্দের অর্থ হলো হিংসা না করা, কায়-মনো বাক্যে হিংসা বর্জন করা, কারো অনিষ্ট না করা, থাণীহত্যা হতে বিরত থাকা, সকল জীবকে রক্ষা করা, মানবতা, কৌমলতা, দয়া, করুণা প্রভৃতি প্রদর্শন করা। বুদ্ধ বলেছেন, ‘শুধু নিজেকে ভালোবাসলে হবে না, ভালোবাসতে হবে সকল জীবকে।’ বুদ্ধ এ নীতি প্রবর্তন করেছিলেন। এখানে একটি অহিংসা বিষয়ক কথাইনি তুলে ধরা হলো।

বৃদ্ধা মা ও বউ

অনেক দিন আগের কথা। এক গ্রামে কাত্যায়নী নামে একজন মহিলা বসবাস করতেন। তাঁর একটি মাত্র ছেলে ছিল। ছেলেটি ছিল খুবই আদরের। তিনি পরম মমতায় তাকে শালন-পালন করেন। মায়ের বয়স হলে ছেলেটিও তাঁর সেবা ও যত্ন করত। মায়ের বিপদ-আপদকে নিজের বিপদ-আপদ মনে করত। বলা যায়, খুব যত্নসহকারে মায়ের দেখাশোনা করত। এভাবে মা ও ছেলে দুজনই সুখে দিন অতিবাহিত করতে থাকেন। একদিন মা মনে করলেন, আমি আর কত দিন বাঁচব- এ ভেবে এক সুন্দরী মেয়ের সাথে ছেলের বিয়ে দিলেন। বিয়ের পরেও ছেলে আগের মতোই তার মায়ের সেবা- যত্ন করতে থাকে। মায়ের প্রতি এ ধরনের ভালোবাসা দেখে সুন্দরী বউয়ের মনে খুব হিংসা উৎপন্ন হলো। কিন্তু হিংসা স্বামীকে দেখতে পারত না। এভাবে স্ত্রীর হিংসা দিন দিন আরো বাঢ়তে থাকে। হিংসাবশত স্বামীর সাথে সে প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ করত। একদিন ঝগড়ার সময় স্ত্রী স্বামীকে বলল, ‘তোমার মায়ের সাথে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমার মাকে চলে যেতে বগো, নতুনা আমি চলে যাব।’

ছেলে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্ত্রীর মন রক্ষার জন্য বলল, ‘মা! তুমি আমার স্ত্রীর সাথে রোজই ঝগড়া করো। যেদিকে তোমার মন চায় চলে যেতে পারো।’ মনের দুঃখে মা দূরসম্পর্কের একজন আত্মায়ের বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। দিন-রাত পরিশ্রম করার বিনিময়ে মা নিজের থাকা-থাওয়ার ব্যবস্থা করে নিলেন।

এদিকে বউয়ের একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করল। নাতি হয়েছে শুনে মা খুবই খুশি হলেন। তবে মনে ব্যথা পেলেন। তিনি ভাবলেন : আমার আদরের নাতিকে আমি আজও দেখতে পেলাম না। বিনা অপরাধে আমি ঘরছাড়া। পৃথিবীতে কি ধর্ম বলতে কিছুই নেই? একপ বলে মা আক্ষেপ করলেন। মা স্থির করলেন ধর্মপূজা করবেন। থালায় সাজালেন নানাবিধি ফুল, পানি, সুগন্ধি আর প্রদীপ। এদিকে দেবরাজ ইন্দ্র অসহায় মায়ের করুণ অবস্থা দেখলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে তিনি উপস্থিত হলেন।

ব্রাহ্মণ বললেন, ‘বৃড়িমা, তুমি কী করছ?’

বৃড়িমা উত্তর দিলেন, ‘আমি ধর্মপূজা করছি।’

তখন বৃড়িমা ছেলে ও বউয়ের সব কথা খুলে বললেন।

ইন্দ্র বললেন, ‘মা, তুমি দুঃখ করো না। খুব শীঘ্ৰই তোমার বউ ও ছেলের মনের পরিবর্তন হবে। কারণ তাদেরও একটি ছেলে হয়েছে। তুমি ঘরে যাও। আমি দেবরাজ ইন্দ্র।’

দেবরাজ ইন্দ্রকে মা ভঙ্গি সহকারে প্রণাম জানিয়ে বাড়ির পথে রওয়ানা হলেন। এদিকে তাঁর বউয়ের যে সহিংস মনোভাব ছিল, তা আর নেই। যে ক্রোধ দেখাত, সেগুলো আর নেই। বউয়ের মন দমিত হলো। নিজের হিংসাকে সে প্রশংসিত করল। পথের অর্ধেক যেতে না যেতেই মা দেখলেন ছেলে আর বট নাতি নিয়ে এগিয়ে আসছে। ছেলেটি বৃক্ষ মারের কোলে নাতিকে তুলে দিল। ওরা দূজনে বলল ‘মা, দেখ তোমার নাতি।’ বট তার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করল। মাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে গেল। নিজের হিংসা ত্যাগ করে আবার সকলে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে লাগল।

অনুশীলনমূলক কাজ
 ‘হিংসা’ শব্দের অর্থ লেখো।
 হিংসার কুফল বর্ণনা করো।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করো

১. সিদ্ধার্থের অপর নাম ছিল ।
২. সিদ্ধার্থের জন্মের খবর শুনে অনেক রাজপ্রাসাদে আগমন করেন।
৩. যশোধরা নামেও পরিচিত ছিল।
৪. বৌদ্ধধর্মে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
৫. ছোট-বড় সকল জীবের প্রতি অপরিসীম মমত্ববোধ ছিল।

মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. পুরাহিতরা মন্ত্রপাঠ	সিদ্ধার্থ খুশি হলেন।
২. শরাহত রাজহাস্যটি	মধ্যেও সিদ্ধার্থের মনে শান্তি ছিল না।
৩. ছন্দকের কথা শুনে	বৃক্ষ করে দিলেন।
৪. রাজপথ পরিচ্ছন্ন ও সজ্জিত করা হলো	রাজার আদেশে।
৫. রাজ-অন্তঃপুরের তোগ-বিলাসের	মৃত্যুবন্ধনায় ছটফট করছিল।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-গ্রন্থ

১. সিদ্ধার্থকে গৌতম বলা হয় কেন?
২. সিদ্ধার্থ কী কী বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন?
৩. বৃক্ষ কোথায় ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. জীবপ্রেম সম্পর্কিত ‘সিদ্ধার্থ ও রাজহৎস’ কাহিনিটি বর্ণনা করো।
২. বুদ্ধের অহিংসা নীতিবিষয়ক গল্পটি ব্যাখ্যা করো।
৩. সিদ্ধার্থ গৌতম ও ছাগশিশুর কাহিনিটি লেখো।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পাথিটিকে খেলার ছলে কে আঘাত করেছিলেন?

- | | |
|--------------|------------|
| ক. সিদ্ধার্থ | খ. রাহুল |
| গ. দেবদত্ত | ঘ. পুরোহিত |

২. রাজা বিষ্ণুর কেন যজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন?

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| ক. পুত্রসন্তান লাভের প্রত্যাশায় | খ. ছাগশিশুকে রাজপ্রাপাদে আনার জন্য |
| গ. রাজ্য বিস্তার করার জন্য | ঘ. রাজ্যের মঙ্গল কামনার জন্য |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রিপন বড়ুয়া ও সুমন বড়ুয়া দুজন বৈমাত্রেয় তাই। রিপন বড়ুয়ার স্ত্রী গুণবত্তী মহিলা। সর্ববিদ্যায় পারদর্শী। তাই সুমন বড়ুয়ার স্ত্রী তার প্রতি বিভিন্নভাবে বিকৃপ আচরণ করতে শুরু করে।

৩. সুমন বড়ুয়ার স্ত্রীর একুপ আচরণকে বৌদ্ধ পরিভাষায় কী বলা যায়?

- | | |
|---------------------|-------------------|
| ক. হিংসাত্মক মনোভাব | খ. শত্রুতা মনোভাব |
| গ. রাগী মনোভাব | ঘ. দ্বেষের মনোভাব |

৪. বড়ুয়ার স্ত্রীর আচরণিক পরিবর্তন বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা—

- i. জীবের থতি অহিংসা মনোভাব পোষণ করা
- ii. সব সময় কৃশল চিন্তা করা
- iii. প্রাণীর প্রতি গভীর দ্রেহ-ভালোবাসা প্রদর্শন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. বিজয় চাকমা শহরে যান্ত্যার সময় দেখলেন, এক পথশিশু গাড়ির সাথে ধাকা খেয়ে মাথায় আঘাত পেয়েছে। এ দৃশ্য সহ্য করতে না পেরে তিনি হাসপাতালে নিয়ে শিশুটির চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। পরে শিশুটি সুস্থ হলে তাকে মায়ের হাতে তুলে দেন।
 - ক. সিদ্ধার্থ চতুর্থ দিন নগর ভ্রমণে গিয়ে কী দেখলেন?
 - খ. বৃক্ষার ছেলে ও বউয়ের মনোভাব কীভাবে পরিবর্তন হলো?
 - গ. বিজয় চাকমার আচরণে সিদ্ধার্থের কোন গুণটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
 - ঘ. উক্ত গুণের ফলে বিজয় চাকমার মন থেকে কী দূরীভূত হতে পারে? বিশ্লেষণ করো।
- ২.

ঘটনা-১

যতন বড়ুয়ার শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় ভাবে দেশনা করলেন— জগতের সবকিছুই অনিত্য ও দুঃখময়। জনোর শেষ পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু। মৃত্যুকে কেউ রোধ করতে পারে না।

ঘটনা-২

জয় চাকমা রাজবনবিহারে গিয়ে ভিঞ্চি-সংঘের পিঞ্চাচরণ দেখে ও সূত্রপাঠ শুনে মুগ্ধ হলেন। নিজের জীবনের পরিবর্তন উপলক্ষ্মি করেন। একপর্যায়ে সংসারের প্রতি তাঁর অনীহা এল। তিনি মা-বাবার অনুমতি নিয়ে সংসার ত্যাগ করে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত হলেন।

- ক. বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সিদ্ধার্থ গৌতম কী লাভ করলেন?
- খ. সকল জীবের প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করতে হয় কেন?
- গ. ঘটনা-১-এর উদ্ধৃতাংশটি পাঠ্যবইয়ের চারি নিমিত্তের কোন ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে?
 - ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. ঘটনা-২-এ জয় চাকমার অনুসৃত পথের ফলাফল ধর্মীয় আলোকে বিশ্লেষণ করো।

ସିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

ବନ୍ଦନା

‘ବନ୍ଦନା’ ବୌଦ୍ଧଦେର ନିତ୍ୟ ପାଳନୀୟ ଏକଟି କର୍ମ । ବନ୍ଦନା ହଲୋ ଗୁଣରାଶି ଛାରଣ ଓ ଅନୁକରଣ କରାର ପ୍ରକିଯାବିଶେଷ । ଧାର୍ମିକ, ଜାନୀ ଏବଂ ଗୁଣୀ ସାଙ୍କ୍ଷିପ୍ତ ବନ୍ଦନାର ଯୋଗ୍ୟ । ମାନବଚିନ୍ତା ସବ ସମୟ ଲୋଭ-ଦେୟ-ମୋହାଦି ପାପେ ଶିଖ ଥାକେ । ବନ୍ଦନା ମାନୁଷେର ମନେର କାଳିମା ବିଦୂରିତ କରେ ଏବଂ ତ୍ରିରତ୍ନେର ପ୍ରତି ଶର୍ମ୍ମା ଜାଗାତ କରେ । ବୁଦ୍ଧ ବଲେଛେନ, ଶର୍ମ୍ମାର ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରାବନ ଅତିକ୍ରମ କରା ଯାଏ । ମାନବଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧିର ଜନ୍ୟ ମାତୃଦୂର୍ଘ ସେମନ ଖୁବଇ ଦରକାର, ତେମନି ଚିନ୍ତର ବିକାଶ ଲାଭ କରାର ଜନ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ବନ୍ଦନା କରା ଆବଶ୍ୟକ । ଏ ଅଧ୍ୟାୟେ ବନ୍ଦନାର ସୁଫଳ, ନିୟମାବଳି, ଦନ୍ତଧାତୁ, ସଞ୍ଚ ମହାସ୍ଥାନ ଏବଂ ମାତୃ-ଶିତ୍ତ ବନ୍ଦନା ସମ୍ପର୍କେ ପଡ଼ିବ ।



ବନ୍ଦନାରତ ଉପାସକ ଉପାସିକାବୃନ୍ଦ

ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷେ ଆମରା-

- * ବନ୍ଦନା ସମ୍ପର୍କେ ବଲତେ ପାରବ;
- * ବନ୍ଦନା କରାର ନିୟମାବଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରତେ ପାରବ;
- * ବନ୍ଦନାର ସୁଫଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରତେ ପାରବ ।

পাঠ : ১

বন্দনা ও বন্দনার সুফল

বন্দনা

‘বন্দনা’ শব্দের বিভিন্ন রকম অর্থ রয়েছে। যেমন : প্রণাম, নমস্কার, অভিবাদন, শ্রদ্ধা, ভক্তি, সম্মান, আনুগত্য সীকার, পূজা, প্রেম, শ্রদ্ধা নিবেদন, অভ্যর্থনা, আরাধনা, উপাসনা, স্তুতিগান ইত্যাদি। মূলত গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা, সম্মান প্রদর্শন করা এবং তাঁদের গুণরাশির স্তুতি করাই হচ্ছে বন্দনা।

‘বুদ্ধ’ শব্দের অর্থ মহাজ্ঞানী। তিনি ছিলেন মানবপুত্র। তাঁকে মহামানব বলা হয়। তাছাড়া তিনি অসীম গুণরাশির অধিকারী ছিলেন। তাই আমরা বুদ্ধের বন্দনা করি। বন্দনার উদ্দেশ্য হলো বুদ্ধের অসীম গুণের স্তুতি বা প্রশংসন করা। বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা। তাঁর আদর্শ অনুসরণ করে নিজের জীবনকে সুন্দর করা।

আমরা শুধু বুদ্ধকে বন্দনা করি না। বুদ্ধ প্রবর্তিত ধর্মকে বন্দনা করি। বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত মহান সংখকেও বন্দনা করি। আমরা বুদ্ধের দন্তধাতু বন্দনা করি। সপ্ত মহাস্থানকে বন্দনা করি। বৌদ্ধিকৃষকে বন্দনা করি। চৈত্যকে বন্দনা করি। বিভিন্ন তীর্থস্থান ও পবিত্র স্থানকে বন্দনা করি। মা-বাবার বন্দনা করি। বন্দনা বৌদ্ধদের নিত্যপালনীয় কর্ম।

বন্দনা বৌদ্ধবিহারে কিংবা বাড়িতে বুদ্ধমূর্তির সামনে বসে করা যায়। বিহার যদি বাড়ির কাছে হয়, তাহলে বিহারে গিয়ে বন্দনা করলে ভালো হয়। আর বিহার যদি দূরে হয়, সে ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে বিহারে গিয়ে বন্দনা করা ভালো। মা-বাবা, ভাই-বোন এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন, বস্ত্রবাস্ত্রবকে নিয়ে বন্দনা করা মজাজ। এ ধরনের বন্দনাকে সমবেত বন্দনা বলা হয়। সমবেত বন্দনার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর হয়। মায়া-মমতা বৃক্ষে পায়। সহমর্মিতা ও বস্ত্রবৃত্তের মনোভাব সুদৃঢ় হয়।

বন্দনার সুফল

মানবজীবনে বন্দনার প্রভাব অগ্রিসীম। বন্দনার সুফল অনেক। বন্দনার মাধ্যমে মন পবিত্র হয়। পুণ্য শান্ত হয়। চিন্ত শুধু হয়। অশান্ত মন শান্ত ও সংযত হয়। লোভ, দ্বেষ এবং মোহ দূরীভূত হয়। অকুশল ও অন্যায় কাজ করার ইচ্ছা জাগে না। মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত হয় এবং সত্য কথা বলতে উৎসাহী হয়। মনে সৎ চিন্তা আসে। ভালো কাজে উৎসাহ আসে। ধৈর্য ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিপায়। অপরের মজাল করার ইচ্ছা জাগে। উন্নত চরিত্রের অধিকারী হওয়া যায়। ইহলোক এবং পরলোকে সুখ লাভ হয়। বন্দনার মাধ্যমে হৃদয়ে মৈত্রীভাব জাগ্রত হয়। তাই সুন্দর জীবন গঠনের জন্য প্রতিদিন বন্দনা করা উচিত।

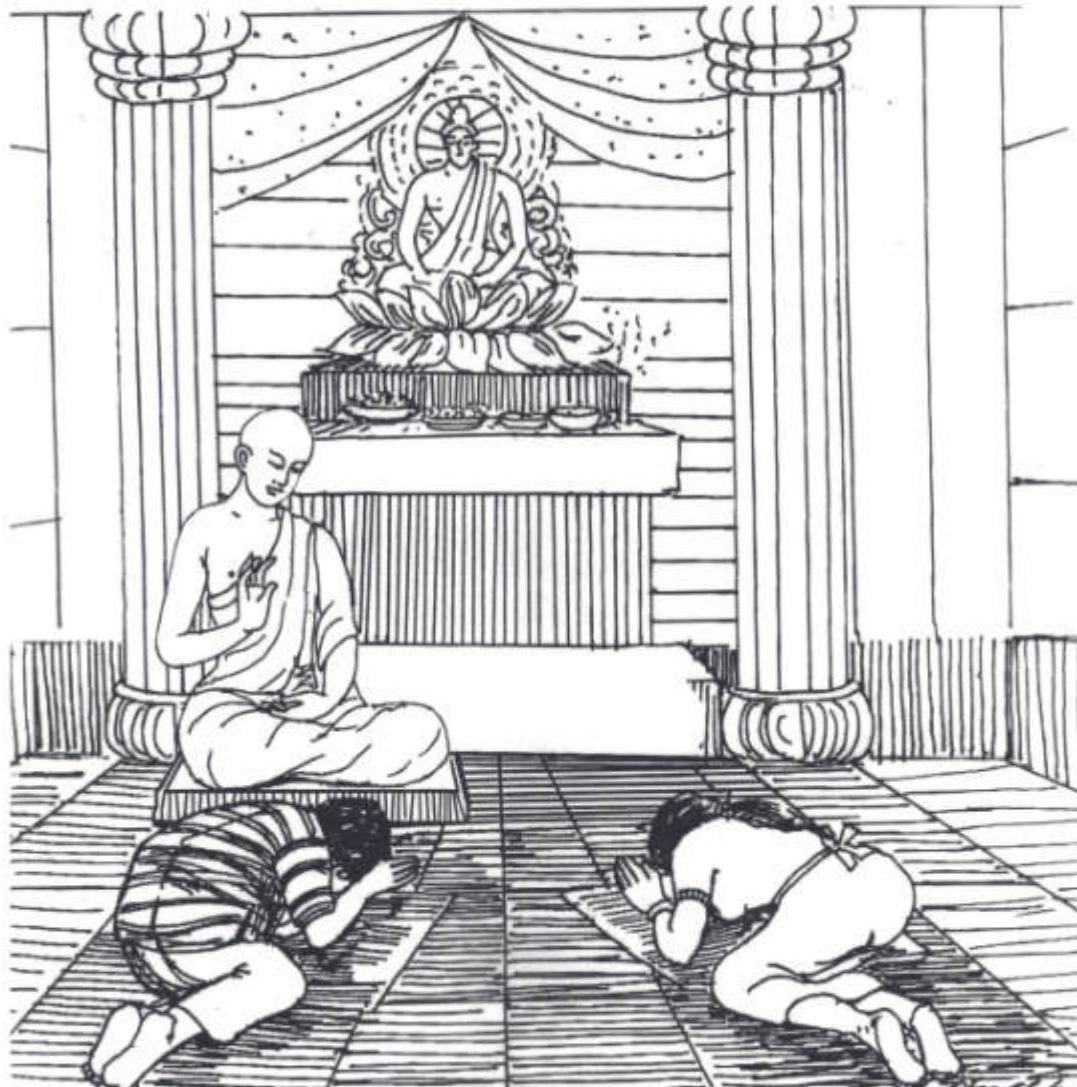
অনুশীলনমূলক কাজ

বন্দনা শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করো।

পাঠ : ২

বন্দনার নিয়মাবলি

বন্দনা করার আগে এবং বন্দনা করার সময় বিভিন্ন নিয়ম অনুসরণ করতে হয়। যেমন : বন্দনার আগে ভালো করে মুখ, হাত ও পা ধূয়ে নিতে হয়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করতে হয়। এতে দেহ ও মন পবিত্র হয়। পবিত্র দেহমনে বন্দনা করলে একাথাতা বৃক্ষ পায়। বন্দনার সময় বুদ্ধমূর্তি কিংবা বুদ্ধের ছবির সামনে ইটু ভেঙে বসতে হয়। তারপর দুই হাতের তালু ঘুষ্ট করে মনোযোগ সহকারে সুর করে বন্দনাগাথা আবৃত্তি করতে হয়। আবৃত্তি স্পষ্ট হওয়া উচিত। প্রত্যেক বন্দনাগাথা আবৃত্তি করার পর ভূমিতে কপাল ঢেকিয়ে শৃঙ্খা সহকারে প্রগাম নিবেদন করতে হয়।



বালক-বালিকা প্রগাম নিবেদন করছে

এখন বুদ্ধের দন্তধাতু, সপ্ত মহাস্থান এবং মাতৃ-পিতৃ বন্দনা শিখব।

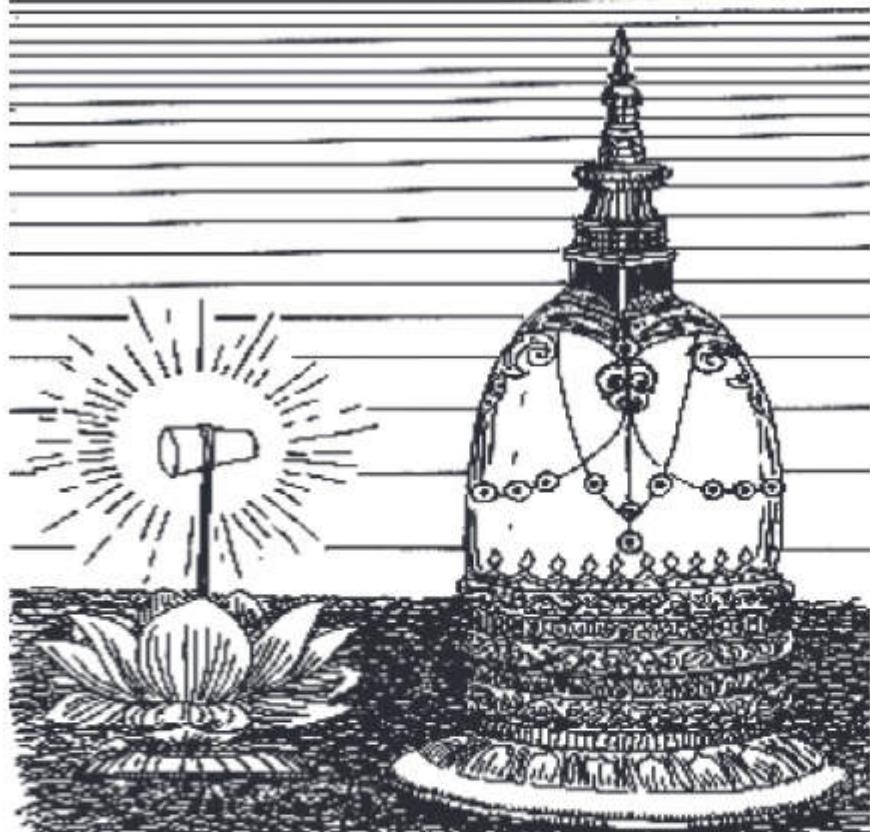
পাঠ : ৩

বুদ্ধের দণ্ডধাতু বন্দনা

বুদ্ধের বিভিন্ন অস্থিধাতু বৌদ্ধদের নিকট অতি পবিত্র। দণ্ডধাতু তন্মধ্যে অন্যতম। চারটি স্থানে বুদ্ধের দণ্ডধাতু যত্নসহকারে রাঞ্চিত আছে বলে জানা যায়। দণ্ডধাতু বন্দনার পালি গাথাটি নিম্নরূপ :

একা দাঠা তিদসপুরে, একা নাগপুরে অঙ্গ
 একা গান্ধার বিসয়ে, একাসি পুন সীহলে,
 চতস্মো তা মহাদাঠা নিবান রসদীপিকা
 পূজিতা নরদেবেহি, তাপি বন্দামি ধাতুযো।

বাংলা অনুবাদ : বুদ্ধের একটি দণ্ড ত্রিদশালয়ে, একটি নাগলোকে, একটি গান্ধার রাজ্যে, একটি সিংহল দ্বীপে রয়েছে। নির্বাণ রস প্রদানকারী এ চারটি মহাদণ্ড নর ও দেবগণের দ্বারা পূজিত। আমিও সেই চার দণ্ডধাতুকে ভক্তিসহকারে বন্দনা করছি।



পাত্রে রাঞ্চিত বুদ্ধের দণ্ডধাতু

অনুশীলনমূলক কাজ

বুদ্ধের দণ্ডধাতু বন্দনাটি সমবেতভাবে আবৃত্তি কর (দলীয় কাজ)।

পাঠ : ৪

সপ্ত মহাস্থান বন্দনা

বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধ বোধিবৃক্ষের পাশে সাতটি স্থানে উন্পঞ্চাশ দিন অবস্থান করেন। সেসময় তিনি কখনো ধ্যানমগ্ন ছিলেন। কখনো পদচারণ করেছেন। কখনো তাঁর উল্লাবিত নবধর্ম সমর্কে চিন্তা করেছেন। বোধিবৃক্ষের চারিপাশে এ রকম সাতটি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সাতটি স্থানকে সপ্ত মহাস্থান বলা হয়। সপ্ত মহাস্থান হলো :

বোধিপালঙ্ক : বুদ্ধ যে আসনে বসে বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন তাকে বোধিপালঙ্ক বলা হয়।

অনিমেষ স্থান : বোধিপালঙ্ক থেকে কিছুটা উত্তর-পূর্ব কোণে অনিমেষ স্থান অবস্থিত। অনিমেষ স্থানে বসে বুদ্ধ সাত দিন ধরে এক পলকে বোধিবৃক্ষের দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন। এজন্য এ স্থান অনিমেষ চৈত্য নামে পরিচিত।

চতুর্মগ স্থান : বোধিপালঙ্ক ও অনিমেষ স্থানের মাঝখানে যে বেদিটি দেখা যায়, তা চতুর্মগ (পদচারণ) স্থান নামে অভিহিত। বুদ্ধ এখানে চতুর্মগ করেছিলেন বলে এরপ নামকরণ হয়।

রত্নঘর : বোধিপালঙ্কের সোজা উত্তর-পশ্চিম পাশের সামান্য দূরে রত্নঘর স্থান অবস্থিত। বুদ্ধ এ স্থানে বসেই ধ্যান করেছিলেন।

অজপাল ন্যাগ্রোথ : এটি বোধিপালঙ্কের সোজা পূর্বদিকে এবং অনিমেষ স্থানের কিছু দক্ষিণ পাশে অবস্থিত। ছাগল পালকেরা এ বৃক্ষের নিচে বসত বলেই এটি অজপাল বৃক্ষ নামে পরিচিতি লাভ করে। বুদ্ধ এ স্থানে ধ্যান করতেন।

মুচলিন্দ স্থান : বোধিপালঙ্কের দক্ষিণ-পূর্বে এটি অবস্থিত। এখানে নাগরাজের বসবাস ছিল। মুচলিন্দ বৃক্ষের নিচে ধ্যান করার সময় নাগরাজ তাঁর দেহ দিয়ে বুদ্ধকে বেফ্টন করে মশা-মাছি, ঝড়-বৃক্ষ প্রভৃতি থেকে রক্ষা করেছিলেন।

রাজায়তন স্থান : বোধিপালঙ্কের সামান্য দক্ষিণ-পূর্বে এবং মুচলিন্দের উত্তর পাশে এটির অবস্থান। রাজায়তন নামে এক ধরনের পার্বত্য বৃক্ষ ছিল বলেই এটি রাজায়তন স্থান নামে পরিচিত। এখানেও বুদ্ধ সাত দিন ধ্যান করেন।

বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত এই সপ্ত মহাস্থান বৌদ্ধদের নিকট অতি পবিত্র। তাই বৌদ্ধরা একাহাচিতে এই সপ্ত মহাস্থানকে বন্দনা নিবেদন করে। সপ্ত মহাস্থান বন্দনাগাথাটি নিম্নরূপ:

পঠমং বোধিপঞ্চাঙ্কং, দুতিষৎ অনিমিসম্প্রিচ

ততিষৎ চতুর্মগং সেট্টং, চতুর্থৎ রতনঘরং

পঞ্চমং অজপালং, মুচলিন্দং ছাট্টমং

সপ্তমং রাজায়তনং, বস্তে তৎ বোধিপাদপং।

বাংলা অনুবাদ : প্রথম বোধিপালজঙ্ক, দ্বিতীয় অনিমেষ স্থান, তৃতীয় চৎক্রমণ স্থান, চতুর্থ রতনঘর স্থান, পঞ্চম অজপাল ন্যাশ্বোধ বৃক্ষ, ষষ্ঠি মুচলিন্দ মূল, সপ্তম রাজায়তনসহ বোধিবৃক্ষকে আমি অবনত শিরে বন্দনা করছি।

অনুশীলনমূলক কাজ
সাতটি মহাস্থানের নাম লিখ ।

পাঠ : ৫

মাতৃ-পিতৃবন্দনা

মাতা-পিতা সন্তান-সন্ততির নিকট পরম পূজনীয়। মাতা-পিতা না থাকলে আমরা এই অগ্রহণ পৃথিবীর সৌন্দর্য কখনো দেখতে পেতাম না। দ্বেহময়ী মাতা পুত্র-কন্যাদের দশ মাস গর্ভে ধারণ করে সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন। তারপর সন্তানকে পৃথিবীর আগো দেখান। পিতা সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ এবং পরম মায়া-মমতায় লালন-পালন করেন। পিতা-মাতা সব সময় সন্তান-সন্ততির মজাল কামনা করেন। এ মহান হিতকামী মাতা-পিতাকে বৌদ্ধরা শ্রদ্ধাচিত্তে বন্দনা জ্ঞাপন করেন। নিচে মাতৃ-পিতৃ বন্দনাগাথা দেওয়া হলো :

মাতৃ বন্দনা
কত্তান কাযে বুধিরং থীরং যা সিনেহ পূরিতা
পায়েত্তা মৎ সংবৰ্ডচেসি বন্দে তৎ মম মাতরং।

বাংলা অনুবাদ : যে জননী রক্তসংজ্ঞাত দ্বেহসিঙ্ক স্তন্য পান করিয়ে আমাকে লালন-পালন করেছেন, সেই মমতাময়ী মাতাকে আমি বন্দনা করছি।

পিতৃ বন্দনা
দয়ায পরিপুর্ণোব জনকো যো পিতা মম
পোসেসি বুদ্ধিং কারেসি বন্দে তৎ পিতরং মম ।

বাংলা অনুবাদ : দয়ায পরিপূর্ণ যে পিতা আমাকে ভরণ-পোষণ করেছেন এবং আমার জ্ঞান-বুদ্ধি বিকশিত করেছেন, সেই পিতাকে আমি বন্দনা করছি।

অনুশীলনমূলক কাজ
মাতৃ-পিতৃ বন্দনা আবৃত্তি কর (দলীয় কাজ) ।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করো

১. বন্দনায় হৃদয়েজাগ্রত হয়।
২. তিনিগুণরাশির অধিকারী ছিলেন।
৩. বুদ্ধ প্রবর্তিতবন্দনা করি।
৪. মা-বাবা সন্তান-সন্ততির নিকট পরম।
৫. বুদ্ধের বিভিন্ন অস্থিধাতু বৌদ্ধদের নিকট অতি।

মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. সমবেত প্রার্থনার মাধ্যমে	বন্দনা করলে একাহাতা বাঢ়ে।
২. মা-বাবা সব সময়	স্পষ্ট হওয়া উচিত।
৩. পরিত্র দেহ-মনে	দন্তধাতু বন্দনা করি।
৪. আবৃত্তি	পারম্পরিক সম্পর্ক গভীর হয়।
৫. আমরা বুদ্ধের	সন্তান-সন্ততির মঞ্চল কামনা করোন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. বন্দনা বসতে কী বোঝায়?
২. বুদ্ধের দন্তধাতু বন্দনাটি বাংলায় লেখো।
৩. সমবেত বন্দনা বসতে কী বোঝায়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বন্দনার সুফলসহ বন্দনার নিয়মাবলি বর্ণনা করো।
২. মাতৃ বন্দনা ও পিতৃ বন্দনা বাংলা অনুবাদসহ বর্ণনা করো।
৩. সঙ্গ মহাস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করো।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ কী?

- ক. জ্ঞানী
গ. লোকিক জ্ঞান

- খ. মহাজ্ঞানী
ঘ. সাধারণ জ্ঞান

২. মানবজীবনে বন্দনার প্রভাব অপরিসীম, কারণ এতে—

- i. মায়া-মতা বৃদ্ধি পায়
- ii. মন পরিত্র হয়
- iii. পুণ্য সংগ্রহ হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | i ও iii |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রাতন বড়ুয়া পরিবার-পরিজন নিয়ে আবাটী পূর্ণিমায় বিহারে গিয়ে প্রথমে বুধপূজা করেন। এরপর ভস্ত্রের প্রতি শান্ত্বা নিবেদন করে একসাথে পঞ্চশীল গ্রহণ করেন।

৩. রাতন বড়ুয়ার কর্মকাণ্ডকে কোন ধরনের বন্দনা বলা যায়?

- | | | | |
|----|-----------------|----|----------------------|
| ক. | সমবেত বন্দনা | খ. | একক বন্দনা |
| গ. | দন্তধাতু বন্দনা | ঘ. | সম্ম মহাস্থান বন্দনা |

৪. বৌদ্ধধর্ম অনুসারে উক্ত কর্মের ফলাফল স্বরূপ—

- i. পারস্পরিক সম্পর্ক গভীর হয়
- ii. বিন্দুশালী হওয়া যায়
- iii. সহমর্মিতা ও বৰ্ধুত্বের মনোভাব সৃষ্টি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | i ও iii |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |



রাজায়তন বৃক্ষের নিচে ধ্যানরত অবস্থায় গৌতম বুদ্ধ

সূজনশীল প্রশ্ন

১. ক. বুদ্ধের কয়টি মহাদত্ত ধাতু নর ও দেবগণের ঘারা পূজিত ?
 - খ. ‘রাজায়তন’ নামকরণের কারণ লেখো ।
 - গ. চিত্রে প্রদর্শিত বুদ্ধের অবস্থান সঙ্গ মহাম্যানের কোনটি নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো ।
 - ঘ. উদ্দীপকে উন্মুক্তি স্থানটির আলোকে বন্দনার সুফল ব্যাখ্যা করো ।

২. প্রত্যয় বড়ুয়া ঘষ্ট শ্রেণির ছাত্র। সে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে বাগানে ফুল তোলে। ফুলগুলো বুদ্ধের মূর্তি বা ছবির সামনে রেখে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সম্ভব্য হলে সে বুদ্ধের সম্মুখে মোমবাতি ও ধূপ দিয়ে পূজা করে। তার আচরণে সবাই মুগ্ধ ।
 - ক. রাত্তুঘর স্থান কোথায় অবস্থিত ?
 - খ. মা-বাবাকে কেন শ্রদ্ধা চিন্তে বন্দনা করা উচিত ?
 - গ. প্রত্যয় বড়ুয়ার আচরণকে বৌদ্ধ পরিভাষায় কী বলা যায় ? ব্যাখ্যা করো ।
 - ঘ. উক্ত আচরণে প্রত্যয় বড়ুয়া ইহলোক ও পরলোকে কী ফল ভোগ করবে ? ব্যাখ্যা করো ।

তৃতীয় অধ্যায়

শীল

বৌদ্ধধর্মে নিয়ম ও শূঙ্গলার ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শীল নিয়ম-শূঙ্গলার ভিত্তি। তাই বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের শীল পালন করা একান্ত কর্তব্য। বৌদ্ধশাস্ত্র গৃহী ও ভিক্ষুদের বিভিন্ন রকম শীল পালনের নির্দেশ আছে। সুন্দর ও পরিত্র জীবন গঠনের জন্য শীল পালন করতে হয়। এ অধ্যায়ে আমরা নিত্যপালনীয় শীল, শীল গ্রহণের নিয়ন্মাবলি এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- * শীল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- * শীল পালনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- * বাংলা অর্থসহ পালি ভাষায় পঞ্চশীল বলতে পারব;
- * পঞ্চশীল পালনের মাধ্যমে অনৈতিক কাজ থেকে বিরত থাকার উপায়সমূহ চিহ্নিত করতে পারব।

পাঠ : ১

শীল পরিচিতি

‘শীল’ শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বত্ত্বাব বা চরিত্র। শীলের আরো অর্থ আছে। যেমন : নিয়ম, নীতি, সংযম, সদাচার, আশ্রয়, শূঙ্গলা ইত্যাদি। কার্যক, বাচনিক ও মানসিক সংযমকে শীল বলা হয়। নৈতিক জীবন গঠনের জন্য শীল পালন অপরিহার্য। গৌতম বুদ্ধ মানুষের চরিত্র সুন্দর করার জন্য শীল পালনের নিয়ম প্রবর্তন করেছেন। দৈনন্দিন জীবনে গৌতম বুদ্ধ প্রবর্তিত শীল পালনের মাধ্যমে আমরা নৈতিকতা অনুশীলন করতে পারি। যাঁরা শীল পালন করেন, তাঁদেরকে বলা হয় শীলবান।

বৌদ্ধধর্মে নানা রকম শীল রয়েছে। তার মধ্যে পঞ্চশীল গৃহীরা পালন করেন। যাঁরা উপোসথ গ্রহণ করেন তাঁরা অফ্টশীল পালন করেন। তাই অফ্টশীলকে উপোসথ শীলও বলা হয়। শ্রমগংগণ দশশীল পালন করেন। এজন্য দশশীলকে প্রবৃজ্যশীল বলা হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

‘শীল’ শব্দের অর্থ লেখো।

পাঠ : ২

নিত্যপালনীয় শীল

যে শীলগুলো প্রতিদিন পালন করতে হয়, সেগুলোকে নিত্যপালনীয় শীল বলা হয়। পঞ্চশীল নিত্যপালনীয় শীল। এগুলো পালনের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় বা স্থান নেই। সব সময় সর্বত্র পালন করা যায়।

পঞ্চশীলের প্রথম শীলটি প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। প্রাণী হত্যা করলে জন্ম-জন্মান্তরে নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। প্রত্যেকে নিজের জীবনকে ভালোবাসে। তাই কোনো প্রাণীকে আঘাত এবং হত্যা করা উচিত নয়। প্রথম শীলটি দ্বারা কেবলপ্রাণি হত্যা থেকে বিরত থাকা বোঝায় না। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রত্যেক প্রাণীর ক্ষতিসাধন হতে বিরত থাকার শিক্ষাও দেয়। এই শীলটি ছোট-বড়, হীন-উভয়, দৃশ্য-অদৃশ্য

সকল প্রাণীকে রক্ষা করতে উদ্দৃষ্ট করে। দ্বিতীয়টি চুরি বা অদন্ত বস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। চুরি একটি সামাজিক অপরাধও বটে। চুরি করলে সাজা এবং দণ্ড ভোগ করতে হয়। সুনাম নষ্ট হয়। পরিবারে দুর্ভোগ নেমে আসে। তাই চুরি বা অদন্ত বস্তু গ্রহণ করা থেকে সকলের বিরত থাকা উচিত। শ্রেণিকক্ষে সহপাঠীর বই, খাতা, কলম, পেনসিল প্রভৃতি না বলে গ্রহণ করা অনুচিত। পঞ্চশীলের দ্বিতীয় শীলটি মানুষকে কেবল চুরি বা অদন্ত বস্তু গ্রহণ থেকে বিরত রাখে না, অধিকস্তু সৎ উপায়ে নিজের পরিশ্রমে অর্জিত বস্তু বা অর্থের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে শিক্ষা দেয়। লোভহীন জীবনযাপনে উদ্বৃষ্ট করে।

তৃতীয় শীলটি কামাচার বা ব্যতিচার থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। এই শীলটি মানুষকে অন্তের আচার-আচরণ পরিহারপূর্বক নৈতিক জীবনযাপন করতে উদ্বৃষ্ট করে। ফলে পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সুশূর্জল ও নিরাপদ হয়।

চতুর্থ শীলটি মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। মিথ্যাবাদীকে সকলে দূর্ণ করে, অপছন্দ করে এবং বিশ্঵াস করে না। যারা মিথ্যা কথা বলে, তারা সর্বত্র নিষিদ্ধ হয়। এই শীলটি মানুষকে কর্কশ, অস্ত্রিয়, অশ্রুল, কাটু, অসার কথা, পরনিষ্ঠা এবং সত্য গোপন করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। ফলে কায়, বাক্য এবং মন পরিশূল্প হয়।

পঞ্চম শীলটি সুরা ও মাদকদ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে মানুষের চিন্তাশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। বিবেক, বৃদ্ধি এবং হিতাহিত জ্ঞান লোগ পায়। স্বাস্থ্য, ধন-সম্পদ এবং সম্মান নষ্ট হয়। মাদক গ্রহণকারী নানা রুকম পাপকর্মে সিংক থেকে মানুষের ক্ষতি সাধন করে। এমনকি দুরারোগ্য অসুখে আক্রান্ত হয়ে অকালে প্রাণ হারায়। মাদক গ্রহণকারীকে কেউ পছন্দ করে না। তারা ইহকালে যেমন কষ্ট পায়, তেমনি মৃত্যুর পর নরক যজ্ঞণা ভোগ করে। মাদকদ্রব্যের মতো ধূমপানও স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। তাই সকলের মাদকদ্রব্য গ্রহণ এবং ধূমপান থেকে বিরত থাকা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

পঞ্চশীলের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শীল ব্যাখ্যা করো।

পাঠ : ৩

শীল পালনের প্রয়োজনীয়তা

শীল হচ্ছে সমস্ত কুশল ধর্মের আদি। শীল রক্ষাকর্ত। মানবজীবনে শীল অঙ্গল্য সম্পদ। শীল পালন ব্যক্তিত নিজেকে বখনে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় না। জীবনকে সুন্দর পথে পরিচালিত করা যায় না। নৈতিক জীবনযাপন করা যায় না। শীল পালন না করলে বিচার, বিবেচনা ও বৃদ্ধি লোগ পায়। নিজের এবং অপরের মঙ্গল ও বল্যাণসাধনে শীলের মতো আর কিছুই নেই। শীল পালনের মাধ্যমে মন শান্ত হয়। মন শান্ত হলে সকল প্রকার অন্তের কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখা যায়। এই শীল মানুষকে মহান ও শ্রেষ্ঠ করে তোলে। শীল পালনের মাধ্যমে পরিবারে যেমন শান্তি-শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পায়, তেমনিভাবে পারস্পরিক সম্প্রৱীতি এবং সম্ভাবণা সুন্দর হয়। এর মাধ্যমে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। যা কুশল, সত্য এবং সুন্দর তা সবই শীলে রয়েছে। যারা নিজের জীবনকে মহৎ করে তুলেছেন, তাঁরা সবাই শীল পালন করেছেন। সুতরাং শীল পালনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

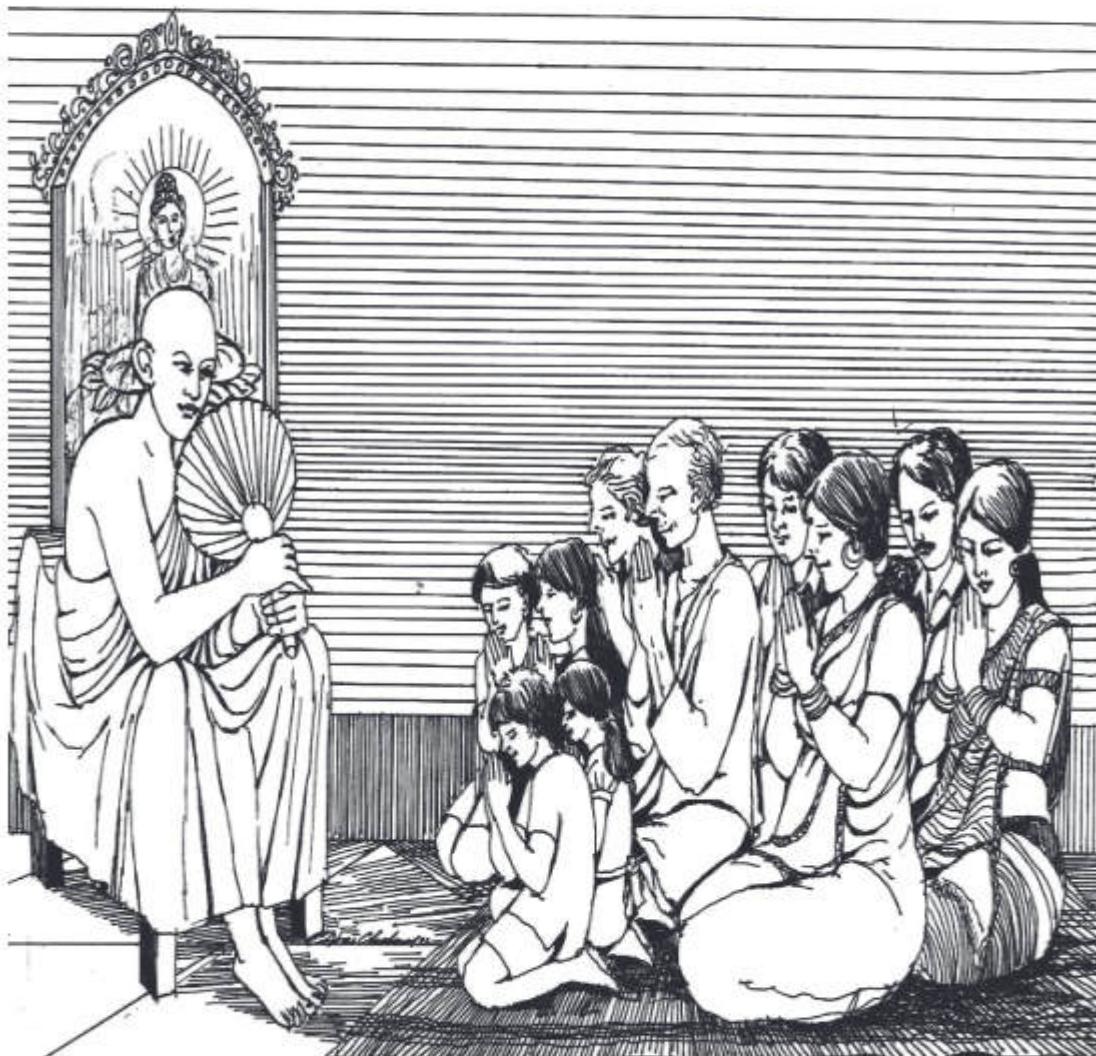
অনুশীলনমূলক কাজ

শীল মানবজীবনে কী পরিবর্তন সাধন করে?

পাঠ : ৪

পঞ্চশীল গ্রহণের নিয়মাবলি

পঞ্চশীল গ্রহণ করার আগে অবশ্যই মুখ, হাত ও পা পরিষ্কার করে ধূয়ে নিতে হয়। পরিষ্কার কাপড় পরতে হয়। এভাবে পঞ্চশীল গ্রহণ করলে মন পবিত্র হয়। শান্ত হয়। পঞ্চশীল গ্রহণ করার সময় করজোড়ে হাঁটু ভেঙে বসতে হয়।



ভিক্ষুর নিকট পঞ্চশীল প্রার্থনা

পঞ্চশীল প্রার্থনা (গালি ও বাংলা)

পঞ্চশীল গ্রহণের পূর্বে ভিক্ষুর নিকট পঞ্চশীল প্রার্থনা করতে হয়। গালিতে প্রার্থনা গাথাটি এরূপ :

পঞ্চশীল প্রার্থনা (গালি)

ওকাস অহং ভন্তে তিসরণেনসহ পঞ্চশীলং ধ্যং যাচামি, অনুঘাঃং কত্তা সীলং দেথ মে ভন্তে ।

দুতিয়ম্পি ওকাস অহং ভন্তে তিসরণেনসহ পঞ্চশীলং ধ্যং যাচামি, অনুঘাঃং কত্তা সীলং দেথ মে ভন্তে ।

ততিয়ম্পি ওকাস অহং ভন্তে তিসরণেনসহ পঞ্চশীলং ধ্যং যাচামি, অনুঘাঃং কত্তা সীলং দেথ মে ভন্তে ।

শেখার কৌশল

১. দৃতিয়ম্পি বলে গাথাটি পুনরায় বলতে হবে ।
২. ততিয়ম্পি বলে গাথাটি পুনরায় বলতে হবে ।
৩. একজন প্রার্থনা করলে 'অহং' এবং বহুজনে যিলে প্রার্থনা করলে 'অহং' এর পরিবর্তে 'মহং' বলতে হবে। অনুরূপভাবে, একজন প্রার্থনা করলে 'যাচামি', বহুজনে করলে 'যাচাম' হবে ।
৪. গালি উচ্চারণের সময় অ-কারন্ত হলে আ-কারন্ত করে উচ্চারণ করতে হয় ।

বাংলা অনুবাদ :

ভন্তে অবকাশপূর্বক সম্মতি প্রদান করুন। আমি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল ধর্ম প্রার্থনা করছি। ভন্তে দয়া করে আমাকে শীল প্রদান করুন।

দ্বিতীয়বার ।

তৃতীয়বার ।

ভিক্ষু : যমহং বদামি তৎ বদেথ (আমি যা বলছি তা বলুন) ।

শীল গ্রহণকারী : আম ভন্তে (হ্যা ভন্তে বলছি)

ভিক্ষু : নমো তস্ম ভগবতো অরহতো সম্মাসমুদ্ধস্ম (আমি অর্হৎ সম্যক সমুদ্ধকে বন্দনা করছি) ।

শীল গ্রহণকারী : নমো তস্ম ভগবতো অরহতো সম্মাসমুদ্ধস্ম (তিনবার বলতে হবে) ।

এরপর ভিক্ষু ত্রিশরণ গ্রহণ করতে বলবেন ।

ত্রিশরণ

বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি (আমি বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করছি) ।

ধ্যং সরণং গচ্ছামি (আমি ধর্মের শরণ গ্রহণ করছি) ।

সংঘং সরণং গচ্ছামি (আমি সংঘের শরণ গ্রহণ করছি) ।

দৃতিয়ম্পি ।

ততিয়ম্পি ।

ভিক্ষু : সরণা গমনং সম্পন্নং (শরণে গমন বা শরণ গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে) ।

শীল প্রার্থনাকারী : আম ভন্তে (হ্যা ভন্তে) ।

তারপর ভিক্ষু পঞ্চশীল প্রদান করবেন এবং শীল গ্রহণকারী তা মুখে মুখে বলবেন ।

পাঠ : ৫

পঞ্চশীল (পালি ও বাংলা)

পঞ্চশীল (পালি)

গাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি ।

অদিঘাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি ।

কামেসু মিছাচারা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি ।

মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি ।

সুরা-মেরেব-মজ্জ পমাদট্টানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি ।

বাংলা অনুবাদ :

আমি প্রানী হত্যা থেকে বিরত থাকব, এ শিঙ্গাপদ গ্রহণ করছি ।

আমি অদণ্ডবস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকব, এ শিঙ্গাপদ গ্রহণ করছি ।

আমি ব্যভিচার থেকে বিরত থাকব, এ শিঙ্গাপদ গ্রহণ করছি ।

আমি মিথ্যাকথা বলা থেকে বিরত থাকব, এ শিঙ্গাপদ গ্রহণ করছি ।

আমি সুরা এবং মাদকজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকব, এ শিঙ্গাপদ গ্রহণ করছি ।

অনুশীলনমূলক কাজ

পালিতে পঞ্চশীল প্রার্থনা করে দেখাও (দলীয় কাজ) ।

পাঠ : ৬

পঞ্চশীল পালনের সুফল

শীল পালনের সুফল অনেক । যেমন : শীল-

- হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা বলা ও মাদক গ্রহণ থেকে বিরত রাখে ।
- মানুষের মনের কালিমা দূর করে ।
- মনকে শান্ত ও সংযত করে ।
- চরিত্র সুন্দর করে ।
- কথা বলায় সংযত করে ।
- বিনয়ী ও ভদ্র করে ।
- অনৈতিক ও পাপকাজ হতে বিরত রাখে ।
- সৎকাজে উৎসাহিত করে ।

শীল পালনের সুফল সম্পর্কে বুদ্ধি বলেছেন, ফুলের গুঁড় কেবল বাতাসের অনুকূলে যায়, প্রতিকূলে যায় না । কিন্তু শীলবান ব্যক্তির অশঙ্কা বাতাসের অনুকূলে যেমন যায়, তেমনি প্রতিকূলেও যায় । হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা ভাষণ, মাদকদ্রব্য গ্রহণ প্রভৃতি অকুশলকর্ম ব্যক্তিজীবনকে কল্পিত করে । কল্পিত ব্যক্তি পরিবার ও সমাজে নানারকম বিশ্রঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি করে । অপর দিকে শীলবান ব্যক্তি সকল প্রকার অকুশল কর্ম হতে বিরত থাকেন । ফলে তাদের পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন সুন্দর ও সুখময় হয় । তাই সকলের শীল পালন ও অনুশীলন করা উচিত ।

অনুশীলনমূলক কাজ

শীল পালনের সুফল সম্পর্কে বুদ্ধি কী বলেছেন ?

অনুশীলনী

শূন্যস্থান প্ররূপ করো

১. শীল শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বভাব বা ।
২. যাঁরা শীল পালন করেন তাঁদেরকে বলা হয় ।
৩. পঞ্চশীল গ্রহণ করার সময় করজোড়ে ভেঙে বসতে হয় ।
৪. এভাবে পঞ্চশীল গ্রহণ করলে পরিত্র হয় ।
৫. পঞ্চশীল শীল ।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. শীল বলতে কী বোঝায়?
২. পঞ্চশীল বলতে কী বোঝায়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. পঞ্চশীল প্রার্থনা বাংলা অনুবাদসহ লেখো ।
২. পঞ্চশীলের প্রথম ও পঞ্চম শীল আলোচনা করো ।
৩. পঞ্চশীলের সুফলসমূহ বর্ণনা করো ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নিত্যগালনীয় শীল কোনটি?

- | | |
|------------|------------|
| ক. পঞ্চশীল | খ. অষ্টশীল |
| গ. দশশীল | ঘ. অর্থশীল |

২. শীল পালনের মাধ্যমে -

- i. শৃঙ্খলিত জীবনব্যাপন করা যায়
- ii. চরিত্র সুন্দর ও পরিত্র করা যায়
- iii. আর্থিক উন্নয়ন করা যায়

- নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মিনুচিং মারমা স্কুলে তার বক্ষ্যুদের ব্যাগ থেকে প্রায়ই না বলে কখনো কলম, কখনো পেনসিল, কখনো খাতা নিয়ে যায়। এতে তার বিন্দুমাত্রও অনুশোচনা হয় না।

৩. মিনুচিং মারমা পঞ্জশীলের কোন নীতি লজ্জন করে?

- | | |
|---------------|---------------------|
| ক. মিথ্যা কথা | খ. অদণ্ডবস্তু গ্রহণ |
| গ. ব্যভিচার | ঘ. মাদক গ্রহণ |

৪. উক্ত আচরণের পরিবর্তনের ফলে মিনুচিং মারমা -

- i. লোভহীন জীবনযাপনে উন্নত হবে
- ii. শান্ত ও সংযত হবে
- iii. বিনয়ী ও ভদ্র হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. শ্রীতিময় চাকমা একজন সফল কৃষক। কৃষিপণ্য বিক্রি করে পরিবারের ভরণপোষণ করে থাকেন। পণ্ডিত্য বাজারে বিক্রি করার সময় কখনো ছলচাতুরী, মিথ্যা কিংবা প্রতারণার আশ্রয় নেন না। উন্নত ও মহৎ জীবনযাপনের জন্য তিনি ধর্মীয় নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করেন। তাঁর আচরণে গ্রামবাসী মুগ্ধ।

ক. শীল কর প্রকার?

খ. নিত্যপালনীয় শীল বলতে কী বোঝায়?

গ. শ্রীতিময় চাকমা যে শীল পালন করে তা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত শীল পালনের দ্বারা শ্রীতিময় চাকমা কী ফল ভোগ করতে পারেন, পাঠ্যবইয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

২. প্রতিমা বড়োয়া একজন পুণ্যবতী মহিলা। তিনি প্রতিদিন বিহারে গিয়ে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের বন্দনা করেন। তিনি আনন্দ হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা কথা বলা ও মাদকজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। এছাড়া অমাবস্যা, অষ্টমী ও পূর্ণিমা তিথিতে যথাযথভাবে শীল পালন করেন।

ক. বিহার কী?

খ. নিত্যপালনীয় শীলের প্রার্থনা পালি কিংবা বাংলায় উল্লেখ করো।

গ. প্রতিমা বড়োয়াকে কোন ধরনের উপাসিকা বলা যায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিমার আচরণ জন্ম-জন্মান্তরে সুগতি লাভ করবে—উত্তরের সপক্ষে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে যুক্তি দাও।

দান

মানুষ যেসব ভালো কাজ করে, তার মধ্যে ‘দান’ অন্যতম। দান বলতে সাধারণত শতান্তরভাবে অন্যকে কিছু দেওয়া বোঝায়। যেমন, শীতের সময়ে ঘাদের ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য গরম কাপড় নেই, তাদেরকে গরম কাপড় বিনামূল্যে দেওয়া। কোনো অসুস্থি মানুষকে প্রয়োজনে রক্ত দেওয়া একটি শতান্তর দানের উদাহরণ। অর্থাৎ আমরা যখন কোনো কিছু দেওয়ার সময় বিনিময়ে অন্য কিছু আশা করি না, এ রকম দেওয়া বা প্রদান করাকে দান বলা হয়। যিনি দান করেন বা দেন তাকে দাতা বলা হয়। আমরা আমাদের চারপাশে অনেককে দান করতে দেখি। দান একটি সেবামূলক কাজ। কারণ, দানের উদ্দেশ্য অন্যের উপকার করা। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, ঔষধ, টাকা ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস থেকে শুরু করে শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কিডনি, রক্ত, চোখ এমনকি জীবনও দান বা উৎসর্গ করা যায়। এজন্য ‘দান’ একটি মহৎ কর্ম। বৌদ্ধধর্মে ‘দান’ অন্যতম কৃশলকর্ম হিসেবে বিবেচিত হয়। বৌদ্ধশাস্ত্রে দানের বিশেষ ব্যাখ্যা আছে। এই অধ্যায়ে আমরা বৌদ্ধ দান সম্পর্কে পড়ব।



শীতাত্ত মানুষকে শীতবন্ধ দান

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- * বৌদ্ধধর্মে দানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব;
- * বিভিন্ন প্রকার দানীয় বস্তুর বিবরণ দিতে পারব;
- * দানের সুফল ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

বৌদ্ধধর্মে দান

যা দেওয়া হয় তা-ই দান। তবে 'দান' নিঃস্বার্থ ও শর্তহীন। যিনি দান করবেন তিনি নিঃস্বার্থভাবে দেবেন। কৃধার্ত ব্যক্তিকে খাদ্য কিংবা শীতার্ত ব্যক্তিকে বস্ত্রদান করে বিনিময়ে কিছু পাওয়ার আশা করা হয় না। এখানে দাতার কোনো স্বার্থ নেই। আমরা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অথবা আনুষ্ঠানিকভা ছাড়াও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস দান করে থাকি। এরূপ দান নিঃস্বার্থ। আমরা অসুস্থ ব্যক্তিকে ঔষধ, সেবা, রক্ত, আর্থিক সহায়তা দান করি। এখানেও দাতার স্বার্থ থাকে না। বৌদ্ধধর্মে শুধু মানুষের দান নয়, পশু-পাখির দানের কাহিনিও আছে যা বুদ্ধের জীবনী ও জাতক পড়ে জানা যায়। যেমন, বুদ্ধ যখন পারগেয় বনে অবস্থান করছিলেন, তখন তাঁকে বানর ও হাতি মধু ও ফল দান করত। দানকর্মের জন্য তারা বৌদ্ধ সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। আমরা যদি প্রকৃতির দিকে তাকাই, তবে দেখি যে, গাছ আমাদের ছায়া দান করে; ফুল অকাতরে সুরভি ও সৌন্দর্য দান করে; নদী তার সুমিষ্ট জল অকৃপণভাবে



ধর্মীয় দান অনুষ্ঠান

দান করে। পরের জন্য এই অকাতুর দান থেকে আমরা দানের মহত্ব উপলব্ধি করতে পারি। বৌদ্ধধর্মে 'দান'—এর কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। বৌদ্ধধর্মের অনুসারীরা শুধু মানুষকে দান করেন না, পশু-পাখি এবং অদৃশ্য প্রাণীদেরও দান করেন। এ ধর্মে মৈত্রী দান করা যায়। 'মৈত্রী' হচ্ছে সকলের ভাগো হোক একপ বন্দনা করা। সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী দান বৌদ্ধধর্মে দানের অনন্য বৈশিষ্ট্য। দান শুধু সকলতার ওপর নির্ভর করে না। ধৰ্মী ব্যক্তি যদিঅনেক কিছু দান করেন কিন্তু চিন্তের পথিক্রতা বা মৈত্রীপূর্ণ দানের চেতনা না থাকে, সে দানও যথার্থ হয় না। বিশেষত বৌদ্ধদের দান দেওয়ার সময় দানীয় বস্তু, দাতা ও দান গ্রহীতার গুণগুণ সম্পর্কে বিবেচনা করতে হয়। দানের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ : ১। বস্তু সম্পত্তি ২। চিন্তা সম্পত্তি ৩। প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি।

বস্তু সম্পত্তি : সৎ উপায়ে অর্জিত সম্পত্তি দান করা উচিত। এতে বেশি ফল লাভ করা যায়। সৎ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা বস্তু দান করলে তাকে উত্তম দান বলা হয়। তাই সৎ উপায়ে অর্জিত দানীয় বস্তুকে বস্তু সম্পত্তি বলা হয়।

চিন্তা সম্পত্তি : দান করার সময় মৈত্রীপূর্ণ কুশল চেতনা নিয়ে দান করতে হয়। বুদ্ধ বলেছেন, চেতনা থেকে উৎপন্ন সৎ কাজই উত্তম কর্ম। লোভ, দীর্ঘা, হিংসা, মোহ ও সংকীর্ণতামুক্ত হয়ে দান করার ইচ্ছাই চিন্তা সম্পত্তি। একপ দানই উত্তম দান।

প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি : শীল পালন দানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শীলে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির দান ও শীলে প্রতিষ্ঠিত দান গ্রহীতার ওপর দানের সুফল নির্ভর করে। শীলবান দান গ্রহীতা হচ্ছেন দান গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র। অর্থাৎ দান করার সময় দানের উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচিত করা উচিত। নৈতিক চারিত্রিক গুণসম্পন্ন শীলবান ব্যক্তিকে দান করলে তা উত্তম দান বলে বিবেচিত হয়। শীলবান গ্রহীতাকে প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি বলা হয়।

দাতার বৈশিষ্ট্য :

- ১। দান ও দানফলে প্রগাঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে।
- ২। দানীয় বস্তু ও গ্রহীতার প্রতি অবহেলা করা উচিত নয়। দাতার নিজের হাতে দান করা উচিত।
- ৩। কৃপণতা ও অনুরোধ বর্জন করে উদার চিন্তে দান করা উচিত।
- ৪। সঠিক সময়ে উপযুক্ত পাত্রে দান করা উচিত।
- ৫। দানের সময় নিজেকে উত্তম ভেবে গ্রহীতাকে অধম মনে করা উচিত নয়।

দাতার উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে দাতাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এরা হচ্ছে :

- ১। দানদাস
- ২। দানসহায়
- ৩। দানপতি

দানদাস : যে দাতা নিজে যা থান তার চেয়ে খারাপ খাবার দান করেন তাকে দানদাস বলা হয়।

দানসহায় : যে দাতা নিজে যেকপ খান অপরকে সেকপ দান করেন তাকে দানসহায় বলা হয়।

দানপতি : যে দাতা নিজে সংযম পালন করে উৎকৃষ্ট বস্তু দান করেন তিনি দানপতি।

অনুশীলনমূলক কাজ

দানের বিবেচ্য বিষয় কী কী?

দান করতে হলে দাতার কী কী গুণ থাকতে হবে, উল্লেখ করো।

পাঠ : ২

দানীয় বস্তু

ছেট-বড় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৌদ্ধরা দান করে থাকেন। এসব অনুষ্ঠান একক বা মৌখিকভাবে পালন করা যায়। তবে পরিকল্পিত অনুষ্ঠান ছাড়াও দান করা যায়। যা দান করা হয়, তাকে বলা হয় দানীয় বস্তু। কী কী দান করা যায় এ বিষয়ে পালি গাথায় দশ রকমের বস্তুর বর্ণনা আছে।

যেমন :

অন্নং পানং বস্তুং যানং

মালাগক্ষ বিলেপনং

সেয্যা বসথ পদীপেয়ং

দানবস্তু ইসে দসা।

বাংলা অনুবাদ : অন্ন, জল, বস্ত্র, যানবাহন, মালা বা পুষ্প, সুগন্ধি বা সুরতি, বিলেপন বা শরীর পরিষ্কার করার জিনিস, গৃহ, শয্যাসামগ্ৰী, প্রদীপ ইত্যাদি উভয় দানীয় বস্তু। এছাড়া বুদ্ধের জীবনী, জাতক ও নীতিগাথায় দানের কাহিনি বর্ণিত আছে, যা থেকে আমরা দানীয় বস্তু সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি।

‘বেস্মান্তর’ জাতকে উল্লেখ আছে যে, রাজা বেস্মান্তর নিজের রাজ্য, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সব দান করে অবশ্যে নিজেকেও দান করেছিলেন। এভাবেই তিনি দান পারমী পূর্ণ করেন। শিব জাতকে শরীর ও চক্ষু দানের উল্লেখ আছে। দাসী পূর্ণা নিজের খাদ্য পোড়া রুটিখানা শুদ্ধাভরে এক শ্রমণকে দান করেছিলেন। ‘কুনাল’ জাতকে পঞ্চপাপা এক শ্রমণকে একতাল মাটিও দান করেছিলেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। অর্থাৎ শুদ্ধাপূর্ণ চিত্তে অন্যের উপকার হয়, একপ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস দান করা যায়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভিক্ষুসংঘকে প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ দান করা হয়। বিপদে, দুর্ঘাগে বিপন্ন ও দুর্ঘ মানুষকে এমনকি অন্যান্য প্রাণীকেও প্রয়োজনীয় বস্তু দান করা যায়। ঔষধসহ সাধারণ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও দানীয় বস্তু হতে পারে। তবে দানীয় বস্তু সংতোষে উপার্জিত হতে হবে। পূর্ববর্তী পাঠে জেনেছি অর্জিত পুণ্যরাশি বৌদ্ধরা দান করেন।

বৌদ্ধ ভিক্ষুরা দেশনা করার সময় উপাসক ও উপাসিকাদের পুণ্য দান করেন। বৌদ্ধ নর-নারীগণ অর্জিত পুণ্যরাশি জীবিত, মৃত আত্মীয়-অনাত্মীয়, বন্ধু, জানা-অজানা জ্ঞাতিবৰ্গ, দেবতা ও প্রেতগণ এমনকি শত্রুর উদ্দেশ্যেও দান করেন। বৌদ্ধরা সকল প্রাণির প্রতি ‘সবে সন্তা সুখীতা ভবস্তু’ বলে মৈত্রী দান করেন। আমরা জানি বিদ্যা অমূল্য ‘ধন, বিদ্যা দান করলে তা আরও বাঢ়ে। বিদ্যার মতো পুণ্যফলও দান করলে ক্ষয় হয় না, আরও বৃদ্ধি পায়।

অনুশীলনমূলক কাজ

কী কী দান করা যায় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো (দানীয় কাজ)।

পাঠ : ৩

দান কাহিনি

এখন আমরা বৌধিসত্ত্বের একটি দান কাহিনি পড়ব। অনেক অনেক দিন আগে ভরত নামে একজন রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি যথাযথভাবে রাজধর্ম পালন করতেন। প্রজাদের সন্তানস্থেহে প্রতিপালন করতেন। দরিদ্র, পথিক, ভিখারি ও যাচকদের মহাদানে সন্তুষ্ট করতেন। সমুদ্র বিজয়া নামে তাঁর এক পঞ্জিত ও জ্ঞানী রানি ছিলেন। একদিন রাজা তাঁর দানশালা পরিদর্শনের সময় ভাবলেন, ‘আমি যে দান করি, তা অনেক সময় দুঃশীল ও লোভী লোকেরা ভোগ করে থাকে। এতে আমার তৃষ্ণি হয় না। আমি শীলবান, উন্নত দানের পাত্র প্রত্যেকবুদ্ধগণকে দান করতে চাই। কিন্তু তাঁরা তো হিমবন্ত প্রদেশে থাকেন। কীভাবে তাদের নিমত্তণ করি?’ তিনি বিষয়টি রানির সঙ্গে আলোচনা করলেন। রানি বললেন, ‘মহারাজ, কোনো চিন্তা করবেন না। আমরা দান, শীল ও সত্য বলে পূর্ণ পাঠিয়ে প্রত্যেকবুদ্ধগণকে নিমত্তণ করব এবং তাঁরা আগমন করলে অষ্টপরিষ্কার যুক্ত দান দেব।’ রাজা প্রস্তাবটি অনুমোদন করলেন এবং সমস্ত নগরবাসীকে শীল পালনের নির্দেশ দিলেন। তিনিও পরিবার পরিজনসহ শীল পালন এবং মহাদান করতে থাকলেন। সোনার পাত্রে ফুল নিয়ে তিনি প্রাসাদ প্রাঙ্গণে নেমে এলেন। এরপর ভূমিতে পূর্বমুখী হয়ে পঞ্চাঙ্গে প্রণাম করে পূর্ব দিকে যে সকল অর্হৎ আছেন সকলকে প্রণাম করলেন। পূর্বদিকে কোনো প্রত্যেকবুদ্ধ থাকলে তাঁদেরকে ভিক্ষা গ্রহণের অনুরোধ করলেন। এরপর সাতমুষ্টি ফুল নিষ্কেপ করলেন। পূর্বদিকে কোনো প্রত্যেকবুদ্ধ ছিলেন না বলে পরদিন কেউ এলেন না।

এভাবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনেও তিনি দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের প্রত্যেকবুদ্ধদের প্রতি পূর্ণ নিষ্কেপ করলেন। নমস্কার করে প্রত্যেকবুদ্ধগণকে আমত্তণ জানালেন। কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। চতুর্থ দিনে উন্নত দিকে একইভাবে আমত্তণ জানালেন। উন্নত-হিমালয়ে বসবাসকারী প্রত্যেকবুদ্ধগণের গুহায় রাজা প্রেরিত পূর্ণ পৌছে গেল। তাঁদের শরীরে সেই ফুলগুলো পতিত হলো। তাঁরা চিন্তা করে জানতে পারলেন রাজা ভরত তাঁদের নিমত্তণ করছেন। তখন তাঁরা সাতজন প্রত্যেকবুদ্ধকে রাজার নিমত্তণ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করলেন। এই সাতজন প্রত্যেকবুদ্ধ আকাশপথে রাজস্বারে এসে পৌছালেন। রাজা প্রত্যেকবুদ্ধগণকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। অতি সমাদরে তাঁদের রাজস্ব নিয়ে গেলেন। অনেক আপ্যায়ন করালেন। অনেক দান করলেন। পরদিনের জন্য আবারও নিমত্তণ করলেন। এভাবে ছয় দিন পর্যন্ত এন্দের ভোজন ও মহাদান পর্ব শেষে সপ্তম দিনে অষ্টপরিষ্কার দানের আয়োজন করলেন। অনন্তর প্রত্যেকবুদ্ধগণের মধ্যে যিনি প্রধান স্থবির, তিনি দান অনুমোদন করে একপ উপদেশ প্রদান করলেন, ‘দানফলই কেবল আমাদের কাজে আসে। গৃহ, অর্ধ সম্পদ, দেহ, বল সবই ক্ষয়যোগ্য।’ অতঃপর ‘অপ্রমত্ত’ হতে উপদেশ দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

অবশ্যিক ভিক্ষুরাও নিম্নোক্ত উপদেশ প্রদান করে চলে গেলেন :

‘যিনি ধার্মিক এবং শীলবান তাঁর দানফল মরণের পরও তাঁকে অনুসরণ করে। অল্প দানেও মহাফল হয়, যদি তা শুদ্ধাযুক্ত হয়। উর্বর ভূমিতে চারা রোপণ করলে যেমন উন্নত ফসল পাওয়া যায়, সেরূপ শীলবান ও উন্নত ব্যক্তিকে দান করলে মহাফল অর্জিত হয়। দান প্রশংসনীয় কাজ। দান ও প্রজাবলে নির্বাগ লাভ সম্ভব।’

অতঃপর, রাজা ও রানি আজীবন দানব্রতে রত থেকে স্বর্গ লাভ করেন। ঐ রাজা ভরত ছিলেন বৌধিসত্ত্ব এবং রানি সমুদ্র বিজয়া ছিলেন গোপাদেবী। এই কাহিনী শেষে গৌতম বুদ্ধ বলেন, ‘জ্ঞানীরা প্রাচীনকালেও বিবেচনা করে দান করতেন।’

পাঠ : ৪

দানের সুফল

'দান' মানবজীবনের অন্যতম মহৎ গুণ। ছোট-বড় সকল প্রকার দানেরই সুফল আছে। দানের সুফল অনেক। ধর্মগ্রন্থে সেসব সুফলের কথা বর্ণিত আছে। বৌদ্ধধরা ধর্মীয়ভাবে যে দান অনুষ্ঠান করে তার মধ্যে সংখ্যান, অষ্টপরিক্ষার দান ও কঠিন চীবরদান উল্লেখযোগ্য। এসব দানের মাধ্যমে অনেক সুফল অর্জিত হয়। দানের মাধ্যমে দাতা অনেক পুণ্যফল অর্জন করেন। ধন ও যশ-খ্যাতি লাভ করেন। সুন্দর ও সুস্মাচ্ছ্যের অধিকারী হন। দীর্ঘজীবী হন। সর্বত্র প্রশংসিত হন। সকলের প্রিয় হন। অভাব ও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেন না। সুখে জীবন যাপন করেন। চিন্ত লোভ, দ্বেষ ও মোহমুক্ত হয়। মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভ করেন। তিনি দুর্গতি হতে মুক্তি লাভ করেন এবং সুগতিপ্রাপ্ত হন। এছাড়া, দান পারমী পূর্ণ করার মাধ্যমে দাতা স্বোতাপন্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন। তাই মহাকারুণিক বৃদ্ধ তাঁর অনুসারীদের যথাসাধ্য দান করার উপর্যুক্ত দিয়েছেন।

বৌদ্ধধর্মে একক দান অপেক্ষা সমবেত দানকে বেশি ফলদায়ক বলা হয়েছে। এ সমবেত দানসমূহ হলো যেমন, সজ্ঞ দান, অষ্টপরিক্ষার দান, কঠিন চীবরদান ইত্যাদি। এগুলো সম্মিলিতভাবে উদ্যাপিত হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

দানের সুফলের একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করো।

১. ----- হচ্ছে সকলের ভালো হোক একুশ প্রার্থনা করা।
২. অর্জিত সম্পত্তি দান করা উচিত।
৩. লোভ, দীর্ঘা, হিংসা, মোহশূন্য ও সংকীর্ণতামুক্ত হয়ে দান করার ইচ্ছাই।
৪. জ্ঞানীরা প্রাচীনকালেও ----- করে দান করতেন।
৫. দানের মাধ্যমে দাতা অনেক ----- অর্জন করেন।

মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. যিনি দান করবেন	দান করলে মহাফল অর্জিত হয়।
২. রাজা ও রাণি আজীবন	বস্তু সম্পত্তি বলা হয়।
৩. শীলবান ও উন্নত ব্যক্তিকে	তিনি নিঃস্বার্থভাবে দেবেন।
৪. ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে	দানক্রতে রত থেকে স্বর্গ লাভ করেন।
৫. সৎ উপায়ে অর্জিত দানীয় বস্তুকে	ভিক্তু সজ্ঞকে প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ দান করা হয়।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. দাতা কী?
২. কী কী বন্ধু সম্পদ দান করা যায়?
৩. কোন ধরনের দাতাকে দানদাস বলা হয়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. দানপতির বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করো।
২. দানের সুফলসমূহ বর্ণনা করো।
৩. শীলবান ব্যক্তি উত্তম দানের পাত্র – ব্যাখ্যা করো।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বৌদ্ধধর্মে অন্যতম কুশলকর্ম কোনটি?

- | | |
|-----------|----------|
| ক. মৈত্রী | খ. শীল |
| গ. দান | ঘ. ধ্যান |

২. বৌদ্ধধর্মে দাতার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—

- i. উপযুক্ত পাত্রে দান করা
- ii. কৃপণতা পরিহার করা
- iii. সময় বিবেচনা করা

- নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

অজয় মারমা একজন সৎ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তাঁর ইচ্ছা হলো স্বর্গীয় মায়ের জন্য দান করা। এ উদ্দেশ্যে তিনি ভিক্ষু সঙ্গকে নিমজ্ঞন করলেন। তাই পূর্বপ্রস্তুতি স্বরূপ দানীয় বন্ধু ঝয়ের জন্য ন্যায্যামূল্যে পণ্য বিক্রি করলেন।

৩. অজয় মারমার দানটিকে ধর্মীয় দৃষ্টিতে কী বলা যায়?

- | | |
|----------------|-----------------|
| ক. পুদগলিক দান | খ. সঙ্গদান |
| গ. অঞ্চলিক দান | ঘ. কঠিন চীবরদান |

৪. এক্সপ দানের দ্বারা স্বর্গীয় মায়ের কী উপকার হবে?

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| ক. সুগতি লাভ করবে | খ. মনুষ্যলোকে জন্ম নেবে |
| গ. নির্বাণ লাভ করবে | ঘ. ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হবে |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. বিজলী বড়ুয়া একজন ধার্মিক উপাসিকা। তিনি প্রায়ই ভাবনা কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত কোর্সে অংশগ্রহণ শেষে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন গুরু ভট্টকে অষ্টপরিক্ষার দান করবেন। এ জন্য যথাসময়ে তিনি দানকার্য সম্পন্ন করেন।

- ক. দাতা কাদেরকে বলা হয়?
- খ. নিঃস্বার্থভাবে দান দেওয়া উচিত কেন?
- গ. বিজলী বড়ুয়ার দানীয় বস্তুর ক্ষেত্রে কোন বিষয়টি বিবেচনা করে দান করেছেন?
পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. বিজলী বড়ুয়ার দানটি মহাফলদায়ক— উক্তরের সপক্ষে পাঠ্যবইয়ের আলোকে যুক্তি দাও।

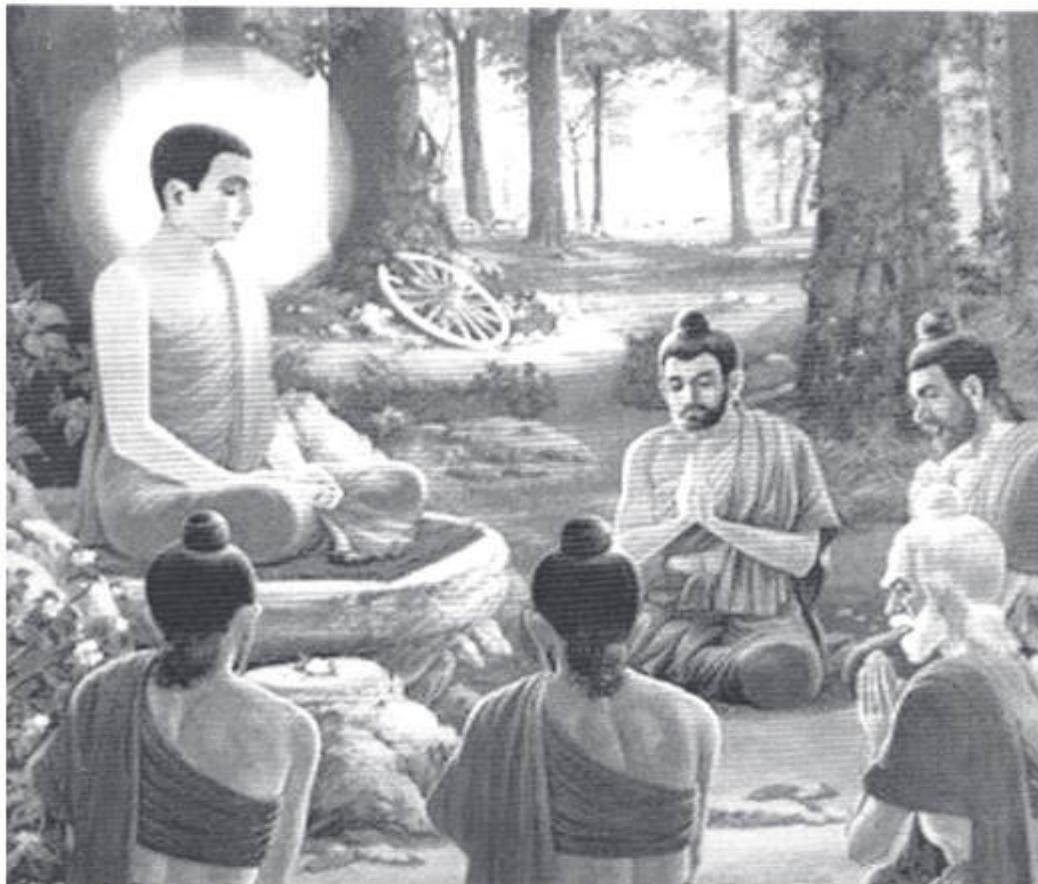
২. অমল তালুকদার একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। তিনি খুব সাধারণ জীবনযাপন করেন। একদিন মার্গলাভী ভিক্ষুকে পিণ্ডদান করবেন বলে মনস্থির করলেন। সঁথিত অর্থ থেকে একটি উৎকৃষ্ট ও দামি পণ্য ক্রয় করলেন। অমল তালুকদারের দান দেখে শ্যামল তালুকদার পরিবারের অভাব-অন্তর্ন দূর করার জন্য এক দানীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

- ক. কোন জাতকে শরীর ও চক্ষুদানের কথা উল্লেখ আছে?
- খ. দানের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো।
- গ. অমল তালুকদারকে কোন ধরনের দাতা বলা যায়? ব্যাখ্যা
- ঘ. শ্যামল তালুকদারের দানটি কতটুকু যুক্তিযুক্ত তোমার উক্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

পঞ্চম অধ্যায়

সূত্র ও নীতিগাথা

গৌতম বুদ্ধ ধর্মোপদেশ দেওয়ার সময় বিভিন্ন সূত্র ও নীতিগাথা ভাষণ করেছেন। এসব সূত্র ও নীতিগাথায় মঞ্জলকর্ম সম্পাদন এবং নৈতিক জীবনযাপনের নির্দেশনা আছে। ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্রপিটকে মূলত নীতিগাথাসমূহ সংরক্ষিত আছে। এ অধ্যায়ে খুদ্দকপাঠ ও ধর্মপদ গ্রন্থের পরিচিতি, মঞ্জলসূত্র ও দণ্ডবর্গের পটভূমি এবং বিষয়বস্তু পড়ব।



বুদ্ধ বোধিবৃক্ষের নিচে বসে শিষ্যদের সূত্র ও নীতিগাথা ভাষণ করছেন

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- * খুদ্দকপাঠ ও ধর্মপদ গ্রন্থের পরিচিতি প্রদান করতে পারব;
- * মঞ্জলসূত্র বাংলা অর্থসহ পালি ভাষায় বলতে পারব;
- * মঞ্জল সূত্রের পটভূমি এবং কীসে মঞ্জল হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- * দণ্ডবর্গের বিষয়বস্তু বর্ণনা করতে পারব;
- * দণ্ডবর্গ অনুসারে দণ্ডের পরিণাম মূল্যায়ন করতে পারব।

পাঠ : ১

খুদ্দকপাঠ ও ধর্মপদ পরিচিতি

বুদ্ধের ধর্মপদেশসমূহ ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থে সংরক্ষিত আছে। বুদ্ধ দেশিত সূত্রসমূহ ত্রিপিটকের অন্তর্গত সূত্রপিটককে পাওয়া যায়। খুদ্দকপাঠ হচ্ছে সূত্রপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের প্রথম গ্রন্থ। ‘খুদ্দকপাঠ’ শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্ষুদ্র বা সহজিষ্ঠ পাঠ। খুদ্দকপাঠ গ্রন্থে মজ্জালসূত্র পাওয়া যায়। ধর্মপদ ও খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত হিতীয় গ্রন্থ। ধর্মপদে বুদ্ধ ভাষিত বিভিন্ন গাথা পাওয়া যায়। ধর্মপদের অর্থ সঠিক পথ বা ধর্মের পথ। এ গ্রন্থের গাথাগুলো মানুষকে ধর্মের পথে বা সঠিক পথে পরিচালিত করে। তাই এ গ্রন্থের নাম ধর্মপদ। ধর্মপদে ২৬টি অধ্যায়ে ৪২৩টি গাথা আছে। এ অধ্যায়ে আমরা খুদ্দকপাঠের ‘মজ্জালসূত্র’ এবং ধর্মপদের ‘দণ্ডবর্ণ’ পড়ব।

অনুশীলনমূলক কাজ

খুদ্দকপাঠ ও ধর্মপদের পরিচয় দাও।

পাঠ : ২

মজ্জালসূত্রের পটভূমি

মজ্জাল শব্দের অর্থ শুভ বা ভালো। আমরা নিজের ও অন্যের শুভ বা ভালো হোক কামনা করে থাকি। একে মজ্জাল কামনা বলে। অনেক সময়ই মনে প্রশ্ন জাগে, আসলে কীসে বা কী করলে মজ্জাল হয়? মানুষ নানা রকম আচরণ বা চিহ্নকে মজ্জাল ও অমজ্জাল সূচক মনে করে থাকে। যেমন: কোনো কাজে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় অনেকে ডান পা আগে বাইরে দেওয়াকে মজ্জাল মনে করে। অনেকে তরো কলসসহ মেয়ে দেখলে মজ্জাল বা শুভ হয় বলে মনে করে। অনেকে কাক ডাকলে অশুভ হয় মনে করে ইত্যাদি।

গৌতম বুদ্ধের সময়েও লোকেরা কীসে মজ্জাল হয় তা নিয়ে আলোচনা করত। কেউ বলত, ভালো কিছু দেখলে মজ্জাল হয়। কেউ বলত, দেখার মধ্যে মজ্জাল নেই, শোনার মধ্যেই মজ্জাল। আবার, কেউ বলত, শোনার মধ্যে মজ্জাল নেই, মজ্জাল আছে ত্রাণ নেওয়ার মধ্যে, স্বাদ নেওয়ার মধ্যে কিংবা সর্প করার মধ্যে। এভাবে তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হতো। মানুষের পাশাপাশি দেবতাদের মধ্যেও মজ্জাল নিয়ে তর্ক বিতর্ক হতো। কিন্তু এতে কোনো সমাধান হলো না। তখন তাৰতিখ্য স্বর্গের দেবতারা একত্র হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে গেলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাদের কথা শুনে একজন দেবপুত্রকে মর্ত্যলোকে ভগবান বুদ্ধের কাছে গিয়ে এসব বিষয় জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠালেন। ভগবান বুদ্ধ তখন শ্রা঵স্তীর জ্ঞেতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। দেবপুত্রসহ অন্য দেবতারা বুদ্ধকে বস্তন নিবেদন করে মজ্জাল কী জানতে চাইলেন। তার উত্তরে ভগবান বুদ্ধ দেবতা ও মানুষের উপকারের জন্য মজ্জালসূত্র দেশনা করেন। তিনি মজ্জালসূত্রে আটট্রিশ প্রকার মজ্জালের কথা বলেন। এভাবেই ‘মজ্জালসূত্রের’ উৎপত্তি হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

বুদ্ধ কেন মজ্জালসূত্র দেশনা করেছিলেন?

পাঠ : ৩

মঙ্গলসূত্র (পালি ও বাংলা)

১. বহুদেবা মনুস্সা চ, মঙ্গলানি অচিন্তযুৎ

আকঙ্গামানা সোখানং ব্রহ্ম মঙ্গলমুণ্ডমৎ।

বাংলা অনুবাদ : বহু দেবতা ও মানুষ স্বত্তি কামনা করে কীসে মঙ্গল হয় তা চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু কীসে মঙ্গল হয় তা কেউই সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারেননি। আপনি দয়া করে দেবতা ও মানুষের মঙ্গলসমূহ ব্যক্ত করুন।

২. অসেবনা চ বালানং, পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা,

পূজা চ পূজনীযানং, এতৎ মঙ্গলমুণ্ডমৎ।

বাংলা অনুবাদ : মূর্য লোকের সেবা না করা, জ্ঞানী লোকের সেবা করা এবং পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করা উভয় মঙ্গল।

৩. প্রতিরূপ দেসবাসো চ, পুবের চ কতপুঁঞ্চতা,

অন্তসম্মাপণিধি চ, এতৎ মঙ্গলমুণ্ডমৎ।

বাংলা অনুবাদ : (ধর্মত পালনের উপবোগী) প্রতিরূপ দেশে বাস করা, পূর্বকৃত পুণ্যের অভাবে অভাবাহ্বিত থাকা এবং নিজেকে সম্যক পথে পরিচালিত করা উভয় মঙ্গল।

৪. বাহু সচঞ্চল সিঙ্গাঞ্চ, বিনযো চ সুসিক্ষিতো,

সুভাসিতা চ যা বাচা, এতৎ মঙ্গলমুণ্ডমৎ।

বাংলা অনুবাদ : বহু শাস্ত্রে জ্ঞানলাভ করা, বিবিধ শিল্প শিক্ষা করা, বিনয়ী ও সুশিক্ষিত হওয়া এবং সুভাষিত বাক্য বলা উভয় মঙ্গল।

৫. মাতাপিতু উপট্ঠানং, পুত্রাদারসংস সঙ্গহো,

অনাকুলী চ কম্মতা, এতৎ মঙ্গলমুণ্ডমৎ।

বাংলা অনুবাদ : মাতা ও পিতার সেবা করা, জ্যৌ ও পুত্রের উপকার করা এবং নিষ্পাপ ব্যবসা ও বাণিজ্যের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা উভয় মঙ্গল।

৬. দানঞ্চ ধর্মচরিযা চ, এতাতকানঞ্চ সঙ্গহো,

অনবজ্জানি কম্মানি, এতৎ মঙ্গলমুণ্ডমৎ।

বাংলা অনুবাদ : দান দেওয়া, ধর্মচরণ করা, জ্ঞাতিগণের উপকার করা এবং সন্দর্ভে অপ্রমত্ত থাকা উভয় মঙ্গল।

৭. আরতি বিরতি পাপা, মজলানা চ সঞ্জেওয়ো,
অপ্লমাদো চ ধন্মেসু, এতৎ মজলমুক্তমং ।

বাংলা অনুবাদ : কাষ্যিক ও মানসিক পাপকাজে অনাসক্তি, শারীরিক ও বাচনিক পাপ থেকে বিরতি, মদ্যপানে বিরত থাকা এবং অগ্রমন্তভাবে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করা উন্নত মজল ।

৮. গীরবো চ নিবাতো চ, সন্তুষ্টী চ কতঞ্জ্ঞুতা,
কালেন ধ্যাসবণ্ণৎ, এতৎ মজলমুক্তমং ।

বাংলা অনুবাদ : গৌরবনীয় ব্যক্তির গৌরব করা, তাদের প্রতি বিনয় প্রদর্শন করা, প্রাণ বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা, উপকারীর উপকার স্থীকার করা ও যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ করা উন্নত মজল ।

৯. খন্তী চ সোবচসমৃতা, সমগ্নানঞ্চ দসসনৎ,
কালেন ধ্যাসাকচ্ছা, এতৎ মজলমুক্তমং ।

বাংলা অনুবাদ : অমাশীল হওয়া, গুরুজনের আদেশ পালন করা, শ্রমণদের দর্শন করা, যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ করা উন্নত মজল ।

১০. তপো চ ব্রহ্মচরিয়ৎ চ, অরিয়সচ্চান দস্সনৎ,
নিববানৎ সচ্ছিকিরিয়া চ, এতৎ মজলমুক্তমং ।

বাংলা অনুবাদ : তপশ্চর্য ও ব্রহ্মচর্য পালন করা, চারি আর্যসত্য হন্দয়জ্ঞান করা এবং পরম নির্বাণ সাক্ষাৎ করা উন্নত মজল ।

১১. ফুট্ঠস্ম লোকধন্মেহি, চিত্তং যস্ম ন কম্পতি,
আসোকৎ বিরজং খেমৎ, এতৎ মজলমুক্তমং ।

বাংলা অনুবাদ : লাভ ও অলাভ, যশ ও অযশ, নিন্দা ও প্রশংসা, সুখ ও দুঃখ এই আট প্রকার লোকধর্মে অবিচলিত থাকা, শোক না করা, লোভ, দ্বেষ ও মোহের মতো কল্পুতা থেকে মুক্ত থাকা এবং নিরাপদ থাকা উন্নত মজল ।

১২. এতাদিসানি কত্তান, সববৰ্থমপরাজিতা,
সববৰ্থ সোঁথিং গচ্ছতি, তৎ তেসৎ মজলমুক্তমং ।

বাংলা অনুবাদ : এসব মজলকর্ম সম্পাদন করলে সর্বত্র জয় লাভ করা যায় এবং সর্বত্র নিরাপদ থাকা যায় - এগুলো তাঁদের (দেব-মনুষ্যের) উন্নত মজল ।

অনুশীলনমূলক কাজ

মজলসূত্রাটি শুধু উচাইরণে সমস্বরে আবৃত্তি করো । (দলীয় কাজ) ।

মজলসূত্রে বর্ণিত মজলসমূহের তালিকা প্রস্তুত করো । (দলীয়ভাবে) ।

পাঠ : ৪

মঞ্জল সাধনের উপায়

মঞ্জলসূত্রে বুদ্ধ ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মঞ্জল সাধনের উপায় নির্দেশ করেছেন। সূত্রটি পাঠ করলে দেখা যায়, নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি বিকাশ সাধনে মঞ্জলসূত্রের উপদেশসমূহের বাপক ভূমিকা রয়েছে। মঞ্জলসূত্রের প্রতিটি উপদেশে মঞ্জল সাধনের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে।

সূত্রে বলা আছে, পঙ্ক্তি বা জ্ঞানী ব্যক্তির সেবা করতে হবে, মূর্খ লোককে সেবা করা যাবে না। পূজনীয় ব্যক্তির সেবা করলে মঞ্জল সাধিত হয়। সম্বর্ধ আচরণ করা যায় এমন দেশে বসবাস করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ যে দেশে সংভাবে জীবনযাপন করা যায়, সে দেশে বসবাস করলে মঞ্জল সাধিত হয়।

নানাকৃত শাস্ত্র ও বিদ্যা অর্জন করে সুশিক্ষিত হতে হবে। সুশিক্ষিত ব্যক্তির বড় গুণ বিনয় ও ভদ্রতা। মঞ্জলসূত্রে বিনয়ী হতে ও সুভাষিত বাক্য বলতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এরপ নির্দেশনা মেনে চললে মঞ্জল সাধিত হয়।

মাতা-পিতা সন্তানদের অনেক কষ্ট করে শালন পালন করেন। মাতা-পিতার কারণেই আমরা পৃথিবীর আলো দেখি। বিবেকসম্পন্ন মানুষমাত্রই মাতা-পিতার সেবা করা পবিত্র কর্তব্য। স্ত্রী-পুত্রের প্রতিও কর্তব্য পালন করতে হয়। এতে মঞ্জল সাধিত হয়।

সৎ ব্যবসা ও চাকরি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করলে মঞ্জল সাধিত হয়। দান করা, ধর্মাচরণ করা, আত্মীয়-পরিজনের উপকার করা এবং ধর্ম পালনে অবিচল থাকলে মঞ্জল সাধিত হয়।

কায়িক ও মানসিক পাপকাজ হতে বিরত থাকতে হবে। মাদক সেবন না করে অপ্রমত্তভাবে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করলে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের মঞ্জল সাধিত হয়।

গৌরবনীয় ব্যক্তির গৌরব করা, তাঁদের যথাযথ সম্মান ও বিনয় প্রদর্শন করা, নিজের যা আছে তাতে সম্মুক্ত থাকা, উপকারীর উপকার স্বীকার করা এবং যথাসময়ে ধর্ম শ্রবণ করলে মঞ্জল সাধিত হয়।

ক্ষমা মহত্ত্বের লক্ষণ, সকলকে ক্ষমাশীল হতে হবে। গুরু বা শিক্ষকের নির্দেশ প্রতিপালন করতে হবে।

শ্রমণদের দর্শন ও যথাসময়ে ধর্মালোচনা করতে হবে। এভাবে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে মঞ্জল সাধিত হয়।

বৌদ্ধ ধর্মের পরম লক্ষ্য নির্বাণ। কুশলকর্ম সম্পাদন করে নির্বাণ পথে অগ্রসর হতে হয়। এজন্যই মঞ্জলসূত্রে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য পালন ও চতুর্যায় সত্য উপলব্ধি করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যাতে মঞ্জল সাধিত হয়।

ইহজাগতিক লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিষ্ঠা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ এই আট প্রকার লোকধর্মে অবিচল থাকতে পারলে মঞ্জল সাধিত হয়। শোক, পরিতাপ, লোভ, দেব, মোহ — এ সবই ক্ষতিকর। এসব থেকে মুক্ত হতে পারলে মঞ্জল সাধিত হয়।

উল্লিখিত কুশলকর্ম জীবনে অনুশীলন করলে মানুষের মঞ্জল সাধিত হয়। মঞ্জলসূত্রের প্রতিটি নির্দেশনা মানব জীবনে অনুসরণযোগ্য। এই নির্দেশনাসমূহ প্রকৃত অর্থেই ব্যক্তি ও সমাজের মঞ্জল সাধনের উপায় নির্দেশ করে।

অনুশীলনমূলক কাজ

মঞ্জল সাধিত হয় এমন চারটি কর্মের দ্রষ্টান্ত দাও।

পাঠ : ৫

দণ্ডবর্গের পটভূমি

‘দণ্ড’ অর্থ শাস্তি। অন্যায় বা অপরাধ করলে শাস্তি দেওয়া হয়। শাস্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য অপরাধ করার প্রবণতা নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু শাস্তি অনেক সময় অপরাধের পরিমাণ না কমিয়ে আরও অপরাধ করার ইচ্ছা জাগায়। আবার ভূল করে নিরাপরাধ ব্যক্তি শাস্তি পেলে আরও অন্যায় হয় এবং মনৎকষ্ট বৃদ্ধি পায়। দণ্ড বা শাস্তি প্রদান করে অন্যকে কষ্ট দিলে নিজেরও কষ্ট ভোগ করতে হয়। জীবন সকলের কাছেই প্রিয়। অনেক সময় মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। মৃত্যুদণ্ড প্রদান একটি চরম সিদ্ধান্ত। যিনি দণ্ড প্রদান করেন তিনি বিচারক। তাঁকে জ্ঞানী হতে হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি অনেক কিছু বিবেচনা করে শাস্তি বা দণ্ড প্রদান করে থাকেন। দণ্ড বিষয়ে ধর্মপদের দশম অধ্যায়ে চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়। বুদ্ধের বর্ণিত এই ধর্মপোদেশ ‘দণ্ডবর্গ’ নামে অভিহিত। এ বর্গে বুদ্ধ দণ্ডের প্রচলিত ব্যাখ্যা প্রদান করেননি। তিনি শাস্তি প্রদানের সময় শাস্তিভোগকারীর কষ্ট ও মনোবেদন উপলব্ধি করার কথা বলেছেন। শাস্তির জন্য শাস্তি প্রদান নয় বরং চিন্তশুল্বি আনয়ন করতে পারলে অন্যায় অপরাধ নির্মূল করা সম্ভব। হত্যার বদলে হত্যা, আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাত কখনো শাস্তি আনতে পারে না। একসময় মহাকারুণিক ভগবান বুদ্ধ জেতবন বিহারে অবস্থান করেন। তখন দুজন ভিক্ষুর মধ্যে উপবেশন ও শয়ন নিয়ে বিরোধ বা মতানৈক্য সৃষ্টি হলে তা নিরসন বা মীমাংসা করার লক্ষ্যে বুদ্ধ দণ্ড বর্গের ভাষিত গাথাগুলো দেশনা করেন। এটাই দণ্ডবর্গের মূল উৎস বা উৎপত্তির কারণ।

পাঠ : ৬

দণ্ডবর্গ (পালি ও বাংলা)

দণ্ডবন্ধ (পালি)

১. সবেৰ তসম্ভি দণ্ডস্ম সবেৰ ভায়তি মচ্ছনো,

অন্তানৎ উপমৎ কত্তা ন হনেয় ন ঘাতয়ে।

বাংলা অনুবাদ : সবাই দণ্ডকে ভয় করে, মৃত্যুর ভয়ে সবাই সন্তুষ্ট। নিজের সঙ্গে তুলনা করে কাউকে আঘাত কিংবা হত্যা করো না।

২. সবেৰ তসম্ভি দণ্ডস্ম সবেৰসৎ জীবিতৎ পিযৎ

অন্তানৎ উপমৎ কত্তা ন হনেয় ন ঘাতয়ে।

বাংলা অনুবাদ : সকলেই দণ্ডকে ভয় করে, জীবন সবার প্রিয়, সুতৱাং নিজের সঙ্গে তুলনা করে কাউকে প্রহার কিংবা আঘাত করো না।

৩. সুখকামানি ভূতানি যো দণ্ডেন বিহিংসতি,

অন্তনো সুখমেসানো পেচ সো ন লভতে সুখৎ।

বাংলা অনুবাদ : নিজের সুখের জন্য যে সুখপ্রত্যাশী প্রাণীগণকে দণ্ড দেয়, পরলোকে সে কখনো সুখ লাভ করতে পারে না।

৮. সুখকামানি ভূতানি যো দণ্ডেন হিংসতি,

অতনো সুখমেসানো পেচ্ সে লভতে সুখং ।

বাংলা অনুবাদ : নিজের সুখের জন্য যিনি অপর সুখকামী প্রাণীগণকে দণ্ড দেন না, পরলোকে তিনি নিশ্চয়ই সুখ লাভ করবেন ।

৫. মা' বোচ ফরহসৎ করিঃ বৃত্তা পটিবদ্দেয় তৎ,

দুক্খাহি সারস্তকথা পটিদণ্ডা ফুসেয়ু তৎ ।

বাংলা অনুবাদ : কাউকে কটু কথা বলবে না । যাকে কটু কথা বলবে, সে-ও তোমাকে কটু কথা বলতে পারে । ক্রোধপূর্ণ বাক্য দুঃখকর, সেজন্য দণ্ডের প্রতিদণ্ড তোমাকে স্পর্শ করবে ।

৬. সচে নেরেসি অভানৎ কংসো উপহতো যথা,

এস পত্তো'সি নিরবানৎ সারষ্টো তে ন বিজ্জতি ।

বাংলা অনুবাদ : আঘাত পাওয়া কাঁসার মতো যদি নিজেকে সহনশীল রাখতে পারো, তবেই তুমি নির্বাণ লাভ করবে, ক্রোধ থেকে জন্ম নেওয়া বাদবিসম্বাদ আর থাকবে না ।

৭. যথা দণ্ডেন গোপালো গাবো পাচেতি গোচরৎ

এবৎ জরা চ মচু চ আযুৎ পাচেতি পাণিনৎ ।

বাংলা অনুবাদ : রাখাল যেমন দণ্ডাধাতে গরু তাড়িয়ে গোচারণভূমিতে নিয়ে যায়, সেরূপ জরা ও মৃত্যু প্রাণীদের আয়ু তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে ।

৮. অথ পাপানি কম্মানি করৎ বালো ন বুজ্বাতি,

সে হি কম্মেহি দুম্মেধো অগ্গিদড়চো'ব তপ্পতি ।

বাংলা অনুবাদ : নির্বোধ লোক পাপকাজ করার সময় তার ফল সম্বন্ধে অঙ্গ থাকে, সুতরাং দুষ্ট লোক নিজের কর্মের দ্বারা আগুনে পুড়ে যাওয়ার মতো যন্ত্রণা ভোগ করে ।

৯. যো দণ্ডেন অদণ্ডেন্দু অপ্পদুট্টেন্দু দুস্সতি,

দসন্নমঞ্চত্রৰং ঠানৎ খিপ্পমেব নিগচ্ছতি ।

বাংলা অনুবাদ : অদণ্ডনীয় (নির্দোষ) ও নিরাপরাধ ব্যক্তির প্রতি যে ব্যক্তি দণ্ড প্রদান করে, সে ব্যক্তি সহসা দশবিধ অবস্থার মধ্যে অন্যতর (অবস্থা) লাভ করে ।

১০. বেদনৎ ফরহসৎ জানিং সরীরস্স চ ভেদনৎ,

গরকৎ বাপি আবাধৎ চিহ্নকথেপৎ'ব পাপুণে ।

বাংলা অনুবাদ : (তার) তীব্র বেদনা, ক্ষয়ক্ষতি, শরীরের অঙ্গচ্ছেদ, কঠিন ব্যাধি বা চিহ্নবিক্ষেপ প্রাপ্ত হয় ।

১১. রাজতো বা উপস্সন্গঃ অব্ভক্ত্যানৎ' ব দারুণঃ
পরিক্ষয়ঃ'ব এগাতীনৎ, ভোগানৎ'ব পতঙ্গুরঃ ।

বাংলা অনুবাদ : (সে) রাজরোষ বা দারুণ অপবাদের সম্মুখীন হয়, (তার) জ্ঞাতিক্ষয় হয় এবং
সম্পদ নাশ হয় ।

১২. অথব'স্স অগারানি অগ্গি ডহতি পাবকো,
কায়স্স ভেদো দুপ্পঞ্চেশা নিরয়ঃ সো'প্পজ্ঞতি ।

বাংলা অনুবাদ : (তার) ঘর আগুনে পুড়ে যায়, মৃত্যুর পর সে মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি নরকে উৎপন্ন হয় ।

১৩. ন নগ্গচরিযা ন জটা ন পঞ্চা, নানাসকা থভিলসাযিকা বা,
রজো চ জল্লং উক্কুটিকপ্পধানৎ, সোধেন্তি মচং অবিতিপ্লক্ষ্যৎ ।

বাংলা অনুবাদ : নগ্গচর্যা, জটাধারণ, কাদালেপন, অনশন, যজ্ঞভূমিতে শয়ন, ধূলি বা ছাইমাখা, কঠিন
উৎকৃত তপস্যায় নিজেকে পীড়ন করা, এসব জপতপ কিছুতেই সংশয়তরা মানুষকে পবিত্র করতে
পারে না ।

১৪. অলঙ্কতো চেপি সমঃ চরেয়, সন্তো দন্তো নিয়তো ব্রহ্মচারী,
সবেসু ভৃতেসু নিধায দণ্ড, সো ব্রাহ্মণো সো সমণো স ভিক্ষু ।

বাংলা অনুবাদ : অলংকৃত হয়েও যিনি শাস্তি, দমিত ও সব সময় ব্রহ্মচারী, যিনি সকল প্রাণীর প্রতি
হিংসাহীন হয়ে শান্তিময় আচরণ করেন-তিনি ব্রাহ্মণ, তিনিই শ্রমণ এবং তিনিই ভিক্ষু ।

১৫. হিরীনিসেধো পুরিসো কোচি লোকস্মিঃ বিজ্ঞতি,
যো নিন্দং অপ্পবোধতি অস্সো ভদ্রো কসামিব ।

বাংলা অনুবাদ : সুশিক্ষিত ঘোড়া যেমন কশাঘাতকে এড়িয়ে চলে, সেইরূপ লজ্জাবোধে নিন্দনীয়
কাজ এড়িয়ে চলেন এমন লোক কয়জন আছেন?

১৬. অস্সো যথাভদ্রো কসানিবিট্টো, আতাপিনো সংবেগিনো ভবাথ,
সন্ধায সীলেন চ বিরিয়েন চ, সমাধিনা ধৰ্মবিনিছয়েন চ;

সম্পন্নবিজ্জাচরণা পতিস্সতা, পহস্সথ দুক্খমিদং অনপ্পকং ।

বাংলা অনুবাদ : বেতের আঘাতে ভদ্র (সুশিক্ষিত) ঘোড়া যেমন বেগবান হয়, সেইরূপ তোমরা
শক্তিমান ও বেগযুক্ত হও । শুদ্ধা, শীল, শৌর্য, সমাধি ও ধর্মজ্ঞান দ্বারা বিদ্যাচরণসম্পন্ন
ও সৃতিমান হয়ে অপরিমেয় দুঃখরাশি হতে মুক্ত হও ।

১৭. উদকৎ হি নয়তি নেতিকা, উসুকারা নময়তি তেজনৎ,

দারহং নময়তি তচ্ছকা, অভানৎ দময়তি সুব্রতা ।

বাংলা অনুবাদ : জল সেচনকারী যেমন জলকে ইচ্ছামতো চালিত করেন, শর-নির্মাতা যেমন শরকে সোজা করেন, কাঠমিষ্টি (তফ্ক) যেমন কাঠের টুকরাকে ইচ্ছামতো আকার দান করেন, ব্রতচারী ব্যক্তি তেমনি নিজেকে দমন করেন ।

অনুশীলনমূলক কাজ

বিতর্ক অনুষ্ঠান

বিষয় : হত্যাকারীর উপযুক্ত শাস্তি মৃত্যুদণ্ড নয় ।

পাঠ : ৭

দণ্ডের পরিণাম

জীবন সকলেরই প্রিয় । জগতের সকল প্রাণী মৃত্যু ও দণ্ডকে ভয় পায় । তাই অপরকে নিজের মতো ভেবে কাউকে আঘাত করা উচিত নয় । নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য দুর্ভিতি পরায়ণ ব্যক্তি অপরকে দণ্ড দ্বারা আঘাত ও হত্যা করে । কিন্তু দণ্ড প্রয়োগে প্রকৃত সুখ অর্জন করা যায় না । দণ্ডের পরিণাম ভয়াবহ । এতে প্রতিশেধ স্পৃহা জাহাত হয়, শত্রুতা বৃদ্ধি পায় । নিরাপরাধ ব্যক্তিকে দণ্ড প্রয়োগ গুরুতর অপরাধ এবং পাপও বটে । যে দুর্নীতি-পরায়ণ ব্যক্তি নিরাপরাধ ব্যক্তি, কল্যাণ মিত্র বা সাধু ব্যক্তিকে দণ্ড প্রয়োগ করে বা মিথ্যা নিন্দা আরোপ করে, পরিণামস্বরূপ সে দশবিধি দুঃখজনক অবস্থার অন্যতম অবস্থাগাণ্ড হয় । যথা : ১) সে শিরঃপীড়া, শূলরোগ প্রভৃতি দ্বারা তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করে; ২) তার স্বীয় শ্রমলক্ষ সম্পত্তির অপচয় হয়; ৩) তার শারীরিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতি হয়; ৪) তার শরীরের একাংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত, চক্ষুহানি, মেরাদণ্ড বিকৃতি, কুষ্ঠ প্রভৃতি গুরুতর রোগ উৎপন্ন হয়; ৫) সে উন্নাদ, রোগগ্রস্ত হয়; ৬) তাকে রাজাপরাধী সাব্যস্ত করে রাজকর্ম ত্যাগে বাধ্য করা হয়; ৭) সে অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়ে জড়িত হয়ে নিদারণ কলক্ষের ভাগী হয়; ৮) তার আশ্রয়দাতা জ্ঞাতিগণের বিয়োগ হয়; ৯) তার সন্ধিত ধন-সম্পদ নষ্ট হয় এবং ১০) তার গৃহ আগুনে পুড়ে ধৰ্মস হয় ।

এই ভয়াবহ পরিণাম হতে রক্ষা পেতে হলে দণ্ড ত্যাগ করে মৈত্রীভাব পোষণ করা উচিত । বুদ্ধ বলেছেন, শত্রুতা দ্বারা শত্রুতা প্রশংসিত হয় না । মৈত্রী বা ভালোবাসা দ্বারা শত্রুতা প্রশংসিত হয় । যিনি নিজের সুখের জন্য অপর সুখকাতর জীবের প্রতি হিংসা করেন না, দণ্ড প্রয়োগ করেন না, তিনি মৃত্যুর পর পার্থিব ও স্বর্গীয় সুখ উপভোগ করে পরিশেষে পরম নির্বাণসুখ লাভ করেন । তাই সকলের দণ্ড ত্যাগ করা উচিত ।

অনুশীলনমূলক কাজ

দণ্ডের পরিণাম বর্ণনা করো ।

পাঠ : ৮

মঙ্গলসূত্র ও দণ্ডবর্গের শিক্ষা

মঙ্গলসূত্র ও দণ্ডবর্গে বহু শিক্ষণীয় বিষয় আছে। মঙ্গলসূত্রে মানুষকে জ্ঞানী লোকের সেবা করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ জ্ঞানী লোককে অনুসরণ করতে হবে। তাঁর নির্দেশনা মানতে হবে। সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান করতে হবে। ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনযাপনের উপযোগী দেশে বসবাস করতে বলা হয়েছে। ভালো কাজের কথা অরণ করে নিজেকে সঠিক পথে পরিচালিত করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। নানা বিষয়ে বিদ্যা অর্জন, বিনয়ী ও সুশিক্ষিত হওয়ার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। সব সময় সুন্দরভাবে কথা বলতে হবে, যাতে কেউ কষ্ট না পায়। মাতা-পিতা গুরুজনের সেবা করতে হবে। স্ত্রী-পুত্রের উপকার করতে হবে। সৎ ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। দান-কর্ম ও আত্মীয়-স্বজনের উপকার করতে হবে। সম্রূপে অবিচল থাকতে হবে। শারীরিক বা মানসিক পাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে। মাদকদ্রব্য দেবন থেকে বিরত থাকতে হবে। কীর্তিমান সফল ব্যক্তিদের সাফল্যকে স্বীকৃতি দিতে হবে। তাঁদের প্রতি সম্মান জানাতে হবে। অঙ্গে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। উপকারী ব্যক্তির উপকার স্বীকার করতে হবে। যথাসময়ে ধর্মকথা শুনতে হবে। ক্ষমাপরায়ণ হতে হবে। ধৈর্য ও প্রতিপদ বাক্য চর্চা করতে হবে। ভিক্ষু-শ্রমণ দর্শন ও ধর্ম আলোচনা করতে হবে। ধ্যান, সমাধি ও চারি আর্যসত্য অনুধাবন করতে হবে। নির্বাণ পথে পরিচালিত হতে হবে। লাভ-ক্ষতি, খ্যাতি-অখ্যাতি, নিষ্ঠা বা প্রশংসা, সুখ-দুঃখ সর্বক্ষেত্রেই চিন্তকে স্থির রাখা, শোক না করা, লোভ, হিংসা, মোহ প্রভৃতি থেকে মুক্ত থাকার অনুশীলন করে নিরাপদে থাকার চেষ্টা করতে হবে। যাঁরা এ সকল মেনে জীবনযাপন করে, তাঁরা সব সময় সর্বক্ষেত্রে জয়লাভ করতে পারে। মঙ্গলসূত্রে ক্ষুধ এ সমস্ত কাজকে উত্তম বা শ্রেষ্ঠ মঙ্গল বলেছেন। মঙ্গলসূত্রে উপরে বর্ণিত বিষয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারি।

দণ্ডবর্গ পাঠেও গুরুত্পূর্ণ শিক্ষা লাভ করা যায়। দণ্ডবর্গ হতে আমরা শিক্ষা পাই যে দণ্ড প্রয়োগ বা শাস্তি দ্বারা অন্যায় প্রবণতা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করা সম্ভব নয়। অন্যায়কারীকে সৎ পথে পরিচালিত করতে পারলেই অপরাধ প্রবণতা হ্রাস করা সম্ভব। কারো প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে শাস্তি প্রদান করা উচিত নয়। শাস্তি প্রদানের সময় শাস্তির পরিণাম বিবেচনা করতে হয়। অপরকে কষ্ট দিয়ে নিজে সুখী হওয়া যায় না। প্রচলিত আইনে অপরাধীর জন্য যে শাস্তির বিধান আছে তা প্রয়োগে কর্তৃপক্ষকে খুবই সতর্ক হতে হবে। কারণ বলা আছে, তুল বিচারে একাধিক দোষী ব্যক্তি ছাড়া পেয়ে যাক, কিন্তু একজনও নিরাপরাধ ব্যক্তি যেন বিনা দোষে শাস্তি না পায়। দণ্ডবর্গে প্রতিহিংসা ত্যাগ করে মৈত্রী প্রদর্শনের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। কারো প্রতি কটুকথা, ক্রোধপূর্ণ বাক্য বা প্রতিদণ্ড প্রদান করা হতে বিরত থাকতে বলা হয়েছে।

নিরাপরাধ ব্যক্তিকে শাস্তি দিলে ইহজগতে এবং পরজনের নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। ক্ষমা মহত্ত্বের লক্ষণ। মৈত্রী অনুশীলনের মাধ্যমে শত্রুকেও বন্ধু করা সম্ভব। কারণ প্রতি ক্ষুধ হয়ে প্রতিহিংসাবশত দণ্ড বা শাস্তি প্রদান করা উচিত নয়। আত্মসংযম, সহনশীলতা, মৈত্রী ও ক্ষমা অনুশীলন করা উচিত।

দণ্ডবর্গ অন্যের জীবনকে নিজের জীবনের সঙ্গে তুলনা করে শাস্তি প্রদানের পরিণাম অনুধাবন করতে শিক্ষা দেয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

মঙ্গলসূত্র ও দণ্ডবর্গের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের পৃথক তালিকা প্রস্তুত করো।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান প্ররূপ করো।

১. দণ্ড বিষয়ে ধর্মপদের..... চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়।
২. বৃুদ্ধ বর্ণিত মজ্জালসমূহ অনুসরণ করলে সবখানে..... করা যায়।
৩. শান্তি প্রদানের সময় শান্তির..... বিবেচনা করতে হয়।
৪. মা-বাবা ও গুরুজনে..... করতে হয়।
৫. মৈত্রী বা ভালোবাসা দ্বারা.....,বন্ধু করা সম্ভব।

সংক্ষিপ্ত - উভয় প্রশ্ন

১. ত্রিপিটকের কোথায় নীতিগাথাসমূহ সংরক্ষিত আছে?
২. ‘ধর্মপদ’ নামকরণ কেন হলো?
৩. ধর্মপদের কোন অধ্যায়ে ‘দণ্ডবর্গ’ পাওয়া যায়?
৪. মাতাপিতু উপট্ঠান, পুত্রাদারসন্স সঙ্গহো, অনাকুলা চ কম্বন্তা, এতৎ মজ্জালমুত্তমঃ— বাংলায় বজ্ঞানুবাদ করো।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. বৃুদ্ধ কেন মজ্জালসূত্র দেশনা করেছিগেন?
২. কাদের সেবা করলে উভয় মজ্জাল হয়?
৩. ‘নিরাপরাধ ব্যক্তির শান্তি পাওয়া উচিত নয়’ ব্যাখ্যা করো।
৪. মজ্জালসূত্র হতে কী শিক্ষা লাভ করা যায় তা বর্ণনা
৫. দণ্ডের পরিণাম বর্ণনা করো।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘মজ্জালসূত্রে’ কয় প্রকার মজ্জালের কথা বলা হয়েছে?

ক. ২৬	খ. ৩০
গ. ৩২	ঘ. ৩৮
২. ‘মাতাপিতু উপট্ঠান’ বলতে বোঝায়—

ক. মা-বাবাকে সম্মান করা	খ. মাতা-পিতার সেবা করা
গ. মা-বাবার গৌরব করা	ঘ. জ্ঞানী লোকের সেবা করা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

অরিন্দম সিংহ ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। কুলে গিয়ে সে জানতে পারে তার ধর্মীয় শিক্ষক কয়েক দিন যাবৎ অসুস্থ। সে শিক্ষকের সেবা করতে তাঁর বাড়ি গেল।

৩. অরিন্দম সিংহের আচরণে মঙ্গলসূত্রের যে উপদেশটি প্রতিফলিত হচ্ছে, তা হলো-

- i. জ্ঞানী লোকের সেবা করা
- ii. পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করা
- iii. শ্রমণদের দর্শন করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | | | |
|----|----------|----|-------------|
| ক. | i ও ii | খ. | i ও iii |
| গ. | ii ও iii | ঘ. | i, ii ও iii |

৪. অরিন্দমের কাজকে কোন ধরনের কাজ বলা যায়?

- | | | | |
|----|---------|----|---------------|
| ক. | মঙ্গলের | খ. | উত্তম মঙ্গলের |
| গ. | গৌরবের | ঘ. | সম্মানের |

সূজনশীল প্রশ্ন

১.

ঘটনা-১

গুরু জাতকে বোধিসত্ত্ব গৃহ্ণ বা শকুন হয়ে জন্মেছিলেন। বড় হওয়ার পর তিনি বৃদ্ধ মা-বাবাকে দেখাশোনা করতেন। তাঁরা এক পর্বতের ওপর শকুনদের নির্জন গৃহায় থাকতেন। বোধিসত্ত্ব বারানসির শৃশান থেকে মৃত গরুর মাংস এনে মা-বাবাকে খাওয়াতেন।

ঘটনা-২

মিলির মা বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় দেখলেন, পাশের বাড়ির খুকি খালি কলস নিয়ে তাঁর সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছে। এতে মিলির মা তাকে গালমান্দ করেন।

- ক. বুদ্ধের দেশিত সূত্রসমূহ কোথায় সংরক্ষিত আছে?
- খ. বিচারককে জ্ঞানী হতে হয় কেন?
- গ. ঘটনা-১-এর সাথে মঙ্গলসূত্রের কোন শ্লোকের মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. মিলির মায়ের আচরণটি মঙ্গলসূত্রের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

২.

অনুচ্ছেদ-১

রাজু মুখ্যমন্ত্রির চাকরি ফেতে অনেক সুনাম রয়েছে। কিন্তু তাঁর অনেক সহকর্মী অফিসের দায়িত্ব পালনের সময় অন্যায়কে প্রশংস্য দিয়ে বিভিন্ন অকৃশল কর্ম করত। একদিন উৎবর্তন কর্তৃপক্ষ অফিসে অডিট করতে এসে বিভিন্ন অপকর্মের সন্ধান পান। সহকর্মীরা উক্ত অপকর্মের জন্য উল্লেখ রাজুকেই দোষারোপ করেন। ফলে তাঁকে বিভাগীয় শাস্তি ভোগ করতে হয়।

অনুচ্ছেদ-২

হে প্রিয় তুমি যদি কারো প্রতি দ্রুত্ত্ব হও,

কেউ যদি তোমাকে রুষ্ট করে,

মেত্রী ও শাস্তির বাণী উচ্চারণ করো।

সহসা তোমার রাগ থেমে যাবে।

ক. ‘খুদ্দকপাঠ’ শব্দের অর্থ কী?

খ. দেবতারা বুন্দের কাছে কেন গিয়েছিলেন?

গ. অনুচ্ছেদ-১ -এর সাথে দণ্ডবর্গের কোন দিক তুলে ধরা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. অনুচ্ছেদ-২ -এর সাথে দণ্ডবর্গের সাদৃশ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চতুরার্থ সত্য

একদিন আঘাতী পূর্ণিমার রাতে সিদ্ধার্থ জগতের দুঃখমুক্তির উপায় অন্বেষণে গৃহত্যাগ করেন। তারপর ছয় বছর তপস্যার ফলে লাভ করেন বুদ্ধত্ব। আবিক্ষার করেন দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখের কারণ আর্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য। একে বৌদ্ধ পরিভাষায় চতুরার্থ সত্য বলা হয়। চতুরার্থ সত্য বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব। বুদ্ধ পঞ্চবগীয় শিষ্যদের নিকট প্রথম চতুরার্থ সত্য দেশনা করেন। চতুরার্থ সত্য সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায় মানুষ বারবার জন্মগ্রহণ করে দুঃখভোগ করে। এ সত্যকে ভালোভাবে বুবাতে পারলে পরম শান্তি নির্বাণ লাভ সম্ভব। এ অধ্যায়ে আমরা বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি চতুরার্থ সত্য সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- * চতুরার্থ সত্যের ধারণা দিতে পারব;
- * দুঃখসমূহ চিহ্নিত করতে পারব;
- * দুঃখের কারণ ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব;
- * চতুরার্থ সত্যের ধর্মীয় গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

চতুরার্থ সত্য পরিচিতি

চতুরার্থ সত্য বুদ্ধের অনন্য উপলক্ষ্মি। মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে মৃত্যুর পথে ধাবিত হয়। জন্ম এবং মৃত্যুর মাঝামাঝি সময়ে নানা অভিজ্ঞতা ও কাজের মধ্যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। তরুণ বয়সে সিদ্ধার্থ নগর দর্শনে বের হলে ব্যাধি এবং জরাগ্রস্ত মানুষকে দুঃখ ভোগ করতে দেখেন। একদল লোককে শোক করতে করতে মৃতদেহ নিয়ে যেতে দেখেন। জীবনের একপ পরিণতি দেখে তিনি উপলক্ষ্মি করলেন জগৎ দুঃখময়। তারপর, সিদ্ধার্থ সংসারত্যাগী একজন সন্ধ্যাসীকে দেখেন। সাথে থাকা সারথী ছন্দককে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ঈ শান্ত-সৌম্য ব্যক্তিটি কে?’ ছন্দক বললেন, ইনি শান্তি অন্বেষণে সংসার ত্যাগ করেছেন। সিদ্ধার্থও দুঃখমুক্তির উপায় অনুসন্ধানের জন্য গৃহত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। গৃহত্যাগ করে সন্ধ্যাসী হয়ে মানুষের দুঃখমুক্তির উপায় অন্বেষণে তিনি ছয় বছর কঠোর তপস্যা করে দুঃখমুক্তির উপায় চতুরার্থ সত্য আবিক্ষার করেন। চতুরার্থ সত্য হচ্ছে :

- ১ . দুঃখ আর্যসত্য
- ২ . দুঃখের কারণ আর্যসত্য
- ৩ . দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য
- ৪ . দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য।

অনুশীলনমূলক কাজ
চতুরার্থ সত্য কী কী?

পাঠ : ২

চতুরার্থ সত্যের ব্যাখ্যা

দুঃখ আর্যসত্য

জগৎ দুঃখময়। সুখ এখানে ক্ষণস্থায়ী। যা কিছু আমরা সুখ বলে জানি, তা সবই ক্ষণস্থায়ী। সুখের আকাঙ্ক্ষা আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। এই ছুটে চলার মাঝে দুঃখই পাই বেশি। সুখ যেন পরশ পাথর, বুঝে ওঠার আগেই হারিয়ে যায়। মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ মানুষ বুঝতে পারে না সুখের আড়ালেই দুঃখ রয়েছে। জ্ঞানের অভাবে আমরা দুঃখকে চিনতে পারি না। অঙ্গতাই দুঃখকে চিনতে না পারার কারণ। সংসার চক্রে পরিভ্রমণ করে মানুষ দুঃখ ভোগ করে। দুঃখ অনেক প্রকার। বুদ্ধ সেগুলোকে প্রধানত আট ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা :

১. জন্ম দুঃখ
২. জরা দুঃখ
৩. ব্যাধি দুঃখ
৪. মৃত্যু দুঃখ
৫. অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ
৬. প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখ
৭. ইলিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ এবং
৮. পঞ্চক্রম্ময় এ দেহ ও মন দুঃখময়।

এ দুঃখগুলো চৰম সত্য। দুঃখ সর্বজনীন। সকলকে কোনো না কোনোভাবে দুঃখ ভোগ করতে হয়। দুঃখ হতে কারো নিষ্ঠার নেই। তাই বুদ্ধ এগুলোকে দুঃখ আর্যসত্য বলে অভিহিত করেছেন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবন নানা দুঃখে পূর্ণ। জীবিত মানুষ মাত্রেই নানারকম রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। বয়স বাঢ়ে, দাঁত পড়ে, দ্যষ্টিশক্তি কমতে থাকে চলতে-ফিরতে কষ্ট হয়। একে বলে জরাগ্রস্ত হওয়া। বার্ধক্য আঘাত হানে। চুল পাকে। এমনি করে একদিন মৃত্যু আসে। একজনের মৃত্যু হলে প্রিয়জন শোক করে। এভাবে দুঃখের সমুদ্রে মানুষের জীবন ভাসমান।

অনুশীলনমূলক কাজ
দুঃখ আর্যসত্যে বর্ণিত দুঃখসমূহ উল্লেখ করো (দলীয় কাজ)।

দুঃখের কারণ আর্যসত্য

কারণ ছাড়া কোনো কার্যের উৎপত্তি হয় না। সবকিছুরই কারণ আছে। দুঃখ উৎপত্তিরও কারণ আছে। দুঃখ আছে জেনেও মানুষ মায়ার জালে আবদ্ধ হয়ে আরও দুঃখ ভোগ করে। জন্ম নিলেই দুঃখ ভোগ করতে হয়। তাহলে কী কারণে মানুষ জন্মগ্রহণ করে? জন্মের কারণ ত্বরণ। আর ত্বরণের কারণ অঙ্গতা বা জ্ঞানের অভাব। অঙ্গতার কারণে আমরা অসত্যকে সত্য, সত্যকে অসত্য মনে করি। ফলে পৃথিবীর রূপ, রস, স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদিতে আকৃষ্ট হই এবং তা পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়। পতঙ্গ যেমন আগন্তের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আগন্তের কাছে যায় এবং আহত বা হতও হয়, তেমনি মানুষও মোহাচ্ছন্ন হয়ে বারবার দুঃখ ভোগ করে। জগতের ক্ষণস্থায়ী বস্তু পাওয়ার জন্য তীব্র বাসনা জাহাত হয়। এই আকাঙ্ক্ষার ফলেই আমরা বারবার জন্মগ্রহণ করি। কামনা, বাসনা, লোভ, অহংকার, মোহ, শোক-এ সবই ত্বরণ থেকে উৎপত্তি হয়। ত্বরণই দুঃখের কারণ।

অনুশীলনমূলক কাজ
দুঃখের কারণ কী?

দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য

আমরা জেনেছি ত্বকাই দুঃখের কারণ। ত্বকার ফলেই আমরা বারবার জন্মগ্রহণ করি। জন্মগ্রহণ করে অসংখ্য দুঃখ ভোগ করি। সুতরাং ত্বকাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে দুঃখ নিরোধ সম্ভব। ত্বকার ক্ষয় পুনর্জন্ম রোধ করে। ত্বকার বিনাশ করাই দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য।

দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য

রোগ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ঔষধ খেতে হয়। চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে চলতে হয়। সব সমস্যার সমাধান আছে। তথাগত বুদ্ধ কঠোর তপস্যা করে দুঃখ নিরোধের উপায়ও আবিষ্কার করেছেন, যা দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য নামে পরিচিত। বুদ্ধ নির্দেশিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখ নিরোধের উপায়। মার্গ অর্থ পথ। আটটি সত্য পথ অনুসরণ করে আমরা দুঃখ নিরোধ করতে পারি। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ নিম্নরূপ :

১. সম্যক দৃষ্টি
২. সম্যক সংকলন
৩. সম্যক বাক্য
৪. সম্যক কর্ম
৫. সম্যক জীবিকা
৬. সম্যক ব্যায়াম বা প্রচেষ্টা
৭. সম্যক স্মৃতি
৮. সম্যক সমাধি।

অনুশীলনমূলক কাজ
আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কী কী?

পাঠ : ৩

চতুর্বার্য সত্যের ধর্মীয় গুরুত্ব

চতুর্বার্য সত্য বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি। এই সত্যসমূহ বুঝতে না পারলে বৌদ্ধধর্মকে কখনো বোঝা যাবে না। বৌদ্ধধর্মের মূল লক্ষ্য দুঃখ হতে মুক্তি এবং পরম শান্তি নির্বাণ লাভ করা। দুঃখসমূহ কী কী, কী কারণে দুঃখ উৎপন্ন হয়, দুঃখের নিরোধ আছে কি না এবং দুঃখ নিরোধের উপায় প্রভৃতি সঠিকভাবে না জানলে দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। তাই চতুর্বার্য সত্য সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকা দরকার। চতুর্বার্য সত্যের মাধ্যমে দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখ নিরোধের উপায় প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়। চতুর্বার্য সত্য মতে, ত্বকাই মানুষের দুঃখের কারণ। অজ্ঞতার কারণে ত্বক উৎপন্ন হয়। ত্বক হচ্ছে কোনো কিছু পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা। চতুর্বার্য সত্য আমাদের লোভ, হিংসা, মোহ ও অকুশল কর্ম থেকে বিরত থাকার এবং দুঃখ হতে মুক্তির উপায় শিক্ষা দেয়। ফলে চতুর্বার্য সত্যের ধর্মীয় গুরুত্ব যে অপরিসীম, তা সহজে বোঝা যায়।

অনুশীলনমূলক কাজ
কেন চতুর্বার্য সত্য সম্পর্কে ভালো জ্ঞান থাকা দরকার?

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করো

১. সিদ্ধার্থ জগতের উপায় অশ্বেষণে গৃহত্যাগ করেন।
২. বৌদ্ধ ধর্মের মূলতত্ত্ব।
৩. জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র জীবনই পূর্ণ।
৪. দুঃখকে চিনতে না পারার কারণ।
৫. বুদ্ধ নির্দেশিত দুঃখ নিরোধের উপায়।

মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. সুখের আকাঙ্ক্ষা	দুঃখ ভোগ করতে হয়।
২. অভিতার কারণে আমরা অসত্যকে সত্য	আমাদের তাড়িয়ে বেড়ায়।
৩. সকলকে কোনো না কোনোভাবে	দুঃখ নিরোধের উপায়।
৪. ত্বর্ণা হচ্ছে কোনো কিছু পাওয়ার	সত্যকে অসত্য মনে করি।
৫. বুদ্ধ নির্দেশিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই	তৈরি আকাঙ্ক্ষা।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের নামগুলো লেখো।
২. বুদ্ধ দুঃখকে কয় ভাগে বিভক্ত করেন? সেগুলো কী কী।

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. চতুরার্থ সত্য বর্ণনা করো।
২. দুঃখের কারণ আর্যসত্য ব্যাখ্যা করো।
৩. দুঃখ নির্বারণের উপায় আর্যসত্য বর্ণনা করো।
৪. 'চতুরার্থ সত্য'ই 'বৌদ্ধধর্মের মূলভিত্তি' ব্যাখ্যা করো।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কয় প্রকার?

ক. ৪

খ. ৮

গ. ১০

ঘ. ১২

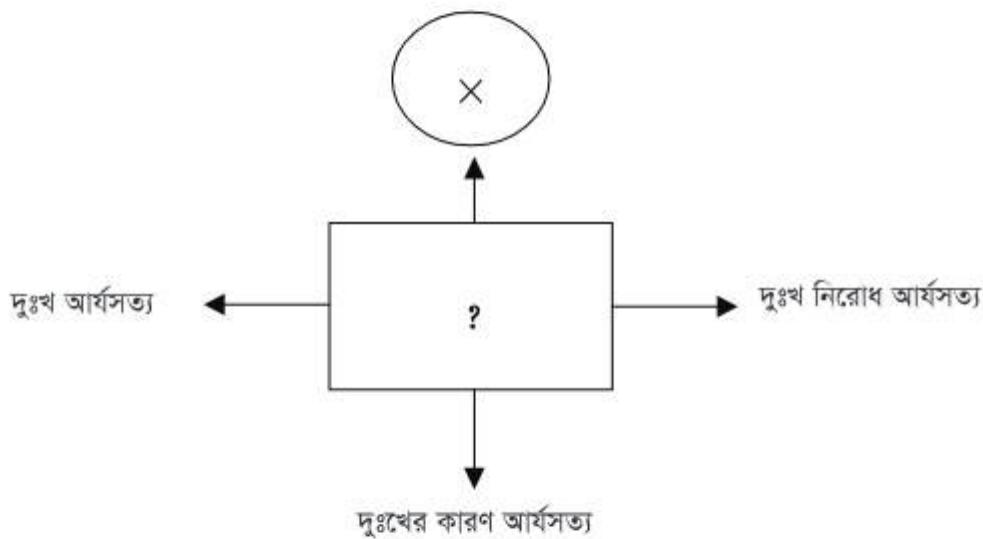
২. চতুর্বার্য সত্যের ধর্মীয় গুরুত্ব-

- i. দুঃখ হতে মুক্তি
- ii. নির্বাণ লাভ করা
- iii. মার্গফল লাভ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের ছক্টি দেখে ৩ ও ৪ নথর প্রশ্নের উত্তর দাও :



৩. ‘?’ চিহ্নের মাধ্যমে ছকে কৌ নির্দেশ করছে?

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| ক. ত্রিপিটক | খ. চতুর্বার্য সত্য |
| গ. আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ | ঘ. ত্রৃষ্ণার ক্ষয় |

৪. ছকে ‘X’ চিহ্নিত স্থানের সত্যটি হলো-

- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| ক. দুঃখ নিরোধের উপায় | খ. হিংসার বিনাশ করা |
| গ. বারবার জন্মাহন করা | ঘ. কামনা-বাসনা পূরণ করা |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. সুষমা একজন রাখাইন মেয়ে। তিনি ও তাঁর বন্ধু একদিন কিয়াং (বিহার) -এ প্রার্থনা করতে গিয়ে একজন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে পদ্মাসনে বসে ঢোখ বন্ধ অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি তখন আরেকজন ভিক্ষুকে জিজ্ঞাসা করলেন, ভাবে, উনি কী করছেন? ভিক্ষু বললেন তিনি ধ্যান-সাধনায় মগ্ন আছেন।

ক. চতুর্বার্য সত্য কী?

খ. দৃঢ়থের কারণ বলতে কী বোঝায়?

গ. বৌদ্ধ ভিক্ষুটি কোন পথ অনুসরণ করছেন? বর্ণনা দাও।

ঘ. উক্ত পথ অনুসরণের ফলে ভিক্ষুটি কোন সত্য উপলব্ধি করতে পারবে বলে তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা দাও।

ঘটনা-১

লাভলী ও সৈকত দম্পতির এক সন্তান। তাঁদের স্বপ্ন সন্তানকে উপযুক্ত পরিবেশ দিয়ে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষের মতো মানুষ করা। কিন্তু সজাদোফে তাঁদের সন্তান উচ্ছ্বাস হয়ে যায়।

ঘটনা-২

ছেটিবেলা থেকে সীমান্ত বড়ুয়া দেখছে তার মা প্রায়ই অসুস্থ থাকেন। রোগযত্রণা বেড়ে গেলে তিনি নিজ সন্তানদের সহ্য করতে পারেন না। একদিন ঐ রোগের কারণে তিনি মৃত্যুবরণ করলেন। মায়ের মৃত্যুর শোক সহ্য করতে না পেরে দুঃখ থেকে মুক্তির আশায় সীমান্ত প্রব্রজ্যাধর্মে দীক্ষিত হলেন।

ক. সিন্ধুর্ধ গৃহত্যাগ করেছেন কেন?

খ. দুঃখ আর্যসত্য কী?

গ. ঘটনা-১ -এ দুঃখ আর্যসত্যের কোন দিক তুলে ধরা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. ঘটনা-২ -এ সীমান্তের অনুসৃত পথ থেকে কোন সত্য উপলব্ধি করতে পারবে বলে মনে করো? ব্যাখ্যা করো।

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব

বৌদ্ধরা নানা রকম আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। যেমন বৃক্ষপূর্ণিমা, আষাঢ়ি পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা, কঠিন চীবরদান ইত্যাদি। বৌদ্ধবিহার এবং পারিবারিক অঙ্গনে এসব আচার-অনুষ্ঠান উদ্যাপন করা হয়। ধর্মীয় বিধি-বিধানমতে আচরণীয় ও পালনীয় অনুষ্ঠানসমূহকে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বলে। কিছু কিছু বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান ধর্মীয় ভাবধারায় জীকজমকপূর্ণভাবে উদ্যাপন করা হয়। সেই আচার-অনুষ্ঠানগুলো ধর্মীয় উৎসব নামে পরিচিত। বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় বছরের বিভিন্ন সময়ে একুশ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। এ অনুষ্ঠানগুলোতে অংশগ্রহণ করে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। এ অধ্যায়ে বৌদ্ধদের কয়েকটি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

* বৌদ্ধ ধর্মীয় বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিতে পারব;

* বৌদ্ধ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সামাজিক গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে পারব।

পাঠ : ১

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব পরিচিতি

বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবসমূহ ধর্মীয় ইতিহাস ঐতিহ্যের সাথে সংগতি রেখেই অনুষ্ঠিত হয়। যে অনুষ্ঠানগুলো চান্দুবছরের নিয়মে অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলো ধর্মীয় তিথি বা পর্ব। যেমন: বৃক্ষপূর্ণিমা, আষাঢ়ি পূর্ণিমা, মধু পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা ইত্যাদি। এছাড়া যে অনুষ্ঠানগুলো বছরের যেকোনো সময় করা যায়, সেগুলোকে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বলা হয়। যেমন: সংজ্ঞাদান, অঘটপরিষ্কারদান, প্রবৃজ্জা, উপসম্পদা অনুষ্ঠান ইত্যাদি। আবার ‘কঠিন চীবরদান’ অনুষ্ঠান করতে হয় বছরের নির্দিষ্ট মাসে। এটিও একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানগুলো পালনের ব্যাপকতায় উৎসবে পরিগত হয়। বর্তমানকালে প্রায় সব অনুষ্ঠানই উৎসবের আকার ধারণ করে।

বৌদ্ধদের বেশির ভাগ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পূর্ণিমা তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। তবে অমাবস্যায় কোনো অনুষ্ঠান আয়োজনে বাধা নেই। বৌদ্ধধর্ম মতে প্রতিটি দিনই শুভ। অশুভ বলে কোনো দিন নেই। নিজের কর্মের মধ্যেই শুভ-অশুভ নির্ভর করে। এমন কোনো সময় নেই, যে সময় ভালো কাজ করলে কোনো সুফল পাওয়া যায় না। ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা অত্যন্ত ভালো কাজ। যেকোনো দিন ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করা যায়। তবে কিছু আচার-অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট দিনেই সম্পাদন করতে হয়। পবিত্র মন নিয়ে এসব দিনে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করা সকলের উচিত। এতে মন প্রসন্ন হয়। চিন্ত শুন্দর হয়। সৎ কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। নৈতিকতা জগ্রত হয় এবং জীবন সুখের হয়।

বৌদ্ধধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো প্রধানত পূর্ণিমাকেন্দ্রিক। প্রতিটি পূর্ণিমার সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের জীবনের কোনো না কোনো অরণ্যীয় ঘটনা জড়িত রয়েছে। বুদ্ধের জীবনাদর্শ অরণ্য ও অনুশীলনের জন্য বিবিধ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবের আয়োজন করা হয়। মূলত, এসব আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবের মাধ্যমে ঐতিহাসিক অরণ্যীয় ঘটনাগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। যুগ যুগ ধরে এই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানগুলো বৌদ্ধরা পালন করে আসছে। প্রতিটি পূর্ণিমায় বৌদ্ধ নর-নারী সকলে বিহারে সমবেত হয়। সম্মিলিতভাবে বৃক্ষপূজা ও উপসন্ধি করে। পঞ্চশীল ও উপোসথিতী গ্রহণ করে। দুপুরে ধ্যান সমাধি চর্চা করে। বিকালে ভিক্ষুদের কাছ থেকে ধর্মকথা বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা -৬ষ্ঠ, ফর্মা নং-৮

শোনে। সম্বৰ্ধ্যায় প্রদীপ পূজা ও পানীয় পূজা করে। অনেক বৌদ্ধবিহারে বিকালে ধর্মসভা ও সম্বৰ্ধ্যায় বৃদ্ধকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। এভাবে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। রাতে নির্মল আনন্দচিত্তে সকলে বাড়ি ফিরে যায়।

এই ধর্মানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধরা একত্র হয়। তাই এসব অনুষ্ঠানের সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে। এ অনুষ্ঠানগুলো একরকম সামাজিক মিলনমেলা। এগুলো ধর্মীয় ভাবগান্ধীর্থে পালন করতে হয়। এ অনুষ্ঠানসমূহে জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সকল প্রাণীর মঙ্গল কামনা করা হয়।

বৌদ্ধদের কিছু অনুষ্ঠান আছে পরিবারকে কেন্দ্র করে। সেগুলোকে পারিবারিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানও বলা যায়। যেমন: শ্রমণের প্রত্রজ্যা, মৃতদেহ সৎকার, সূত্র বা পরিত্রাণ পাঠ প্রভৃতি। এসব অনুষ্ঠানে আতীয় স্বজন, বৰ্ধুবাঞ্চব ও এলাকার লোকজন সমবেত হয়। এসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পারম্পরিক ও সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। তাই এ অনুষ্ঠানগুলোরও সামাজিক গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসব যথাযথ মর্যাদার সাথে প্রতিপালন করা হয়। স্ব স্ব ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবের পাশাপাশি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ উদযাপন করা প্রয়োজন।

অনুশীলনমূলক কাজ

বৌদ্ধ ধর্মীয় কয়েকটি আচার-অনুষ্ঠানের নাম লেখো।

পাঠ : ২

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যোগদানের সুফল

ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো সর্বজনীন। সম্মিলিতভাবেই এসব অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হয়। ফলে এসব অনুষ্ঠানে যোগদানের সুফল অনেক। যেমন: ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যোগদানের ফলে পারম্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, সামাজিক বন্ধন দৃঢ় হয়। ধর্মকথা শ্রবণ করে অস্থির মন শান্ত, প্রসন্ন ও উদার হয়। ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত হয়। কঠিন ধর্মবাণী বুৰুতে সহজ হয়। পুণ্য অর্জিত হয়। দান চিন্তা উদয় হয়। নৈতিক চরিত্র গঠিত হয়। দয়াপ্রায়ণ ও পরোপকার করতে উৎসাহ সৃষ্টি হয়।

এখন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যোগদানের সুফল সম্পর্কে একটি কাহিনি তুলে ধরব। ধেরী উন্মাদুর্বজন্মে এক ধনশালীর গৃহপরিচারিকা ছিলেন। সেই ধনশালী প্রভু সব সময় নানা ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। একদিন উন্মাও অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে প্রভুর ধর্মানুষ্ঠানে যোগদান করেন। তিনি নিজের ইচ্ছায় শ্রদ্ধাচিত্তে অনুষ্ঠানের সকল কাজ সম্পন্ন করেন। এ সময় তিনি মনে মনে কামনা করেন, ভবিষ্যতে তিনিও যেন একজন খ্যাতিসম্পন্ন দাতা হতে পারেন। এই সূক্ষ্ম ও শুভ কামনার ফলে গৌতম বুদ্ধের সময় তিনি শ্রাবণীনগরের এক ধনীর কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রচুর দান করতেন এবং মহান দাতা হিসেবে সুখ্যাতি লাভ করেন। তাই সকলের একাগ্রচিত্তে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা উচিত।

বুদ্ধের সময় শ্রাবণীর একটি এলাকার অধিবাসীরা একটি সর্বজনীন ধর্মোৎসব আয়োজন করার সিদ্ধান্ত নেয়। মহা উৎসাহে সকলে কাজে লেগে গেল। চতুর্দিকে উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হলো। তথাগত বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের নিমজ্জন জানানো হলো। অনুষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল অন্ন-পানীয় দিয়ে বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের শুদ্ধি জানিয়ে বুদ্ধের দেশনা শ্রবণ করা। যথাসময়ে সকল আয়োজন সম্পন্ন হলো। অনুষ্ঠানের দিন বুদ্ধ তাঁর শিষ্যসহ অনুষ্ঠান মন্ত্রে উপস্থিত হলেন। সকলে মিলে তাঁদের অন্ন-পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করল। নিজেরাও দুপুরের খাবার খেল। তাঁরপর শুরু হলো ধর্মালোচনা সভা। এসময় আয়োজকদের উৎসাহে ভাটা পড়ে গেল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বাড়ি ফিরে গেল। কেউবা গল্পগুজব আরম্ভ করল। কিছু লোক ঘুমিয়ে পড়ল। কিছু ৫৯

লোক অন্যমনস্ক ছিল। শ্রদ্ধাচিত্তে ধর্মালোচনায় মনোনিবেশ করল মাত্র কয়েকজন। বৃদ্ধশিষ্যরা বিষয়টি লক্ষ করলেন। তাঁরা তথাগত বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন, এত বড় ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন করে এলাকাবাসী নিজেরা কেন ধর্ম শ্রবণে অপারগ হলো? উভরে বৃদ্ধ বললেন, ‘ধর্মাচরণের আনন্দ সকলে লাভ করতে পারে না। ধর্মের রসবোধ উপলক্ষিতে জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। গভীর সমুদ্র যেমন সকলে পাড়ি দিতে পারে না, তেমনি ধর্মপথ পাড়ি দিতে পারে অল্প কয়জন ব্যক্তি মাত্র। যাঁরা একাগ্রচিন্তা ও সচেতন, তাঁরাই পারে জীবনে শান্তি সমৃদ্ধি অর্জন করতে।’ তাই সর্বদা শুন্ধাচিত্তে একাগ্রতার সাথে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যোগদান করা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে যোগদানের কয়েকটি সুফল লেখো।

পাঠ : ৩

বৃদ্ধপূর্ণিমা

বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিই বৃদ্ধপূর্ণিমা নামে খ্যাত। এ দিনে সিদ্ধার্থ গৌতম হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত শাক্যরাজ্যে রাজপুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। পঁয়াগ্রিশ বছর বয়সে তিনি একই তিথিতে বৃদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষমূলে বোধিজ্ঞান বা বৃদ্ধত্ব লাভ করেন। আশি বছর বয়সে একই পূর্ণিমা তিথিতেই কুশীনগরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। বৌদ্ধ ধর্মীয় ভাষায় এটিকে মহাপরিনির্বাণ বলে। গৌতম বৃদ্ধের মহাজীবনের এই তিনটি মহান ঘটনা বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সংঘটিত হয়েছিল। তাই বৈশাখী পূর্ণিমাকে বৃদ্ধপূর্ণিমাও বলা হয়। বৌদ্ধদের কাছে এ পূর্ণিমার গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। নানা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জ্ঞানজমকের সাথে বৌদ্ধরা বৃদ্ধপূর্ণিমা পালন করে থাকে।



বৃদ্ধপূর্ণিমায় পূজার উপকরণ নিয়ে উপাসক-উপাসিকা বিহারে যাচ্ছেন

সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সূত্র পাঠ ও বুদ্ধকীর্তনের মাধ্যমে প্রভাতফেরি করে বুদ্ধপূর্ণিমা উৎসবের সূচনা হয়। আগের দিন বৌদ্ধবিহারগুলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে নানা রকম ফুল, পাতা ও রঞ্জিন কাগজ দিয়ে সাজানো হয়। এভাবে অনুষ্ঠানে উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হয়। পূর্ণিমার দিন সকালে বুদ্ধপূজা, সমবেত উপাসনায়, পঞ্চশীল ও অষ্টশীল গ্রহণ করা হয়। দুপুর বারোটার আগে ভিক্ষুসঙ্গকে দুপুরের আহার দান করা হয়, যা পিঙ্গদান নামে পরিচিত। দায়ক-দায়িকরাও দুপুরের আহার সম্পন্ন করে বৌদ্ধবিহারে ধ্যান সমাধি করেন। বিকালে ধর্মসভা হয়। এতে গৌতম বুদ্ধের জীবন, ধর্ম, দর্শন বিষয়ে আলোচনা হয়। সম্বৰ্য্যায় প্রদীপ পূজা, বুদ্ধকীর্তন হয়। আজকাল অনেক বৌদ্ধবিহারে এ উপলক্ষে রক্তদানের ব্যবস্থা করা হয়। অনেকে মরণোত্তর চোখ দান করার প্রতিশুতি দেন, যা অম্বের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে সাহায্য করে। সম্বৰ্য্যায় অনেক বৌদ্ধবিহারে ভক্তিমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সমস্ত অনুষ্ঠানে বৌদ্ধ ছাড়াও অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও অংশগ্রহণ করে। বিশেষ করে ধর্মালোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা অংশগ্রহণ করে। এতে সামাজিক ও ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে উঠে, পরম্পরার প্রতি মৈত্রীভাব সৃষ্টি হয়।

বুদ্ধপূর্ণিমা তিথিতে সংঘটিত বুদ্ধের জীবনের তিনটি প্রধান ঘটনা প্রকৃতির সাথে সম্পৃক্ত। এ ঘটনাগুলো রাজপ্রাসাদের বাইরে প্রকৃতির মনোরম পরিবেশে, উন্মুক্ত আকাশের নিচে ঘটেছিল। যেমন: জন্ম হয়েছিল লুম্বিনী কাননে। এটি বর্তমানে নেপালের অন্তর্গত। গাহপালা তরুলতায় ভোঁড়া ছিল লুম্বিনী কানন। বুদ্ধত্ব লাভ হয়েছিল গয়ার উন্মুক্ত বোধিবৃক্ষমূলে। এটি বর্তমানে ভারতের বিহার প্রদেশের অন্তর্গত গয়া জেলায় অবস্থিত।

মহাপরিনির্বাণ হয়েছিল হিন্দুবৰ্তী নদীর তীরস্থ কুশিনগরের জোড়া শালবনক্ষেত্রের মূলে। তাই প্রকৃতির প্রতি ও মৈত্রী প্রদর্শন করতে হবে। বিনা প্রয়োজনে গাছের পাতা ছেঁড়া ও ডালপালা কাটা উচিত নয়। বিদ্যালয় ও বাড়ির আঙিনার আশেপাশে গাছের পরিচর্যা করা সকলের উচিত। প্রকৃতির সাথে আমাদের জীবনের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। আন্তর্জাতিকভাবে এ দিবসটি 'বৈশাখ তে' নামে উদ্ঘাপিত হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

তোমার এলাকার বৌদ্ধবিহারে বুদ্ধপূর্ণিমা অনুষ্ঠানের

একটি দিনব্যাপী কর্মসূচি তৈরি কর (দলীয় কাজ)।

পাঠ : ৪

আষাঢ়ী পূর্ণিমা

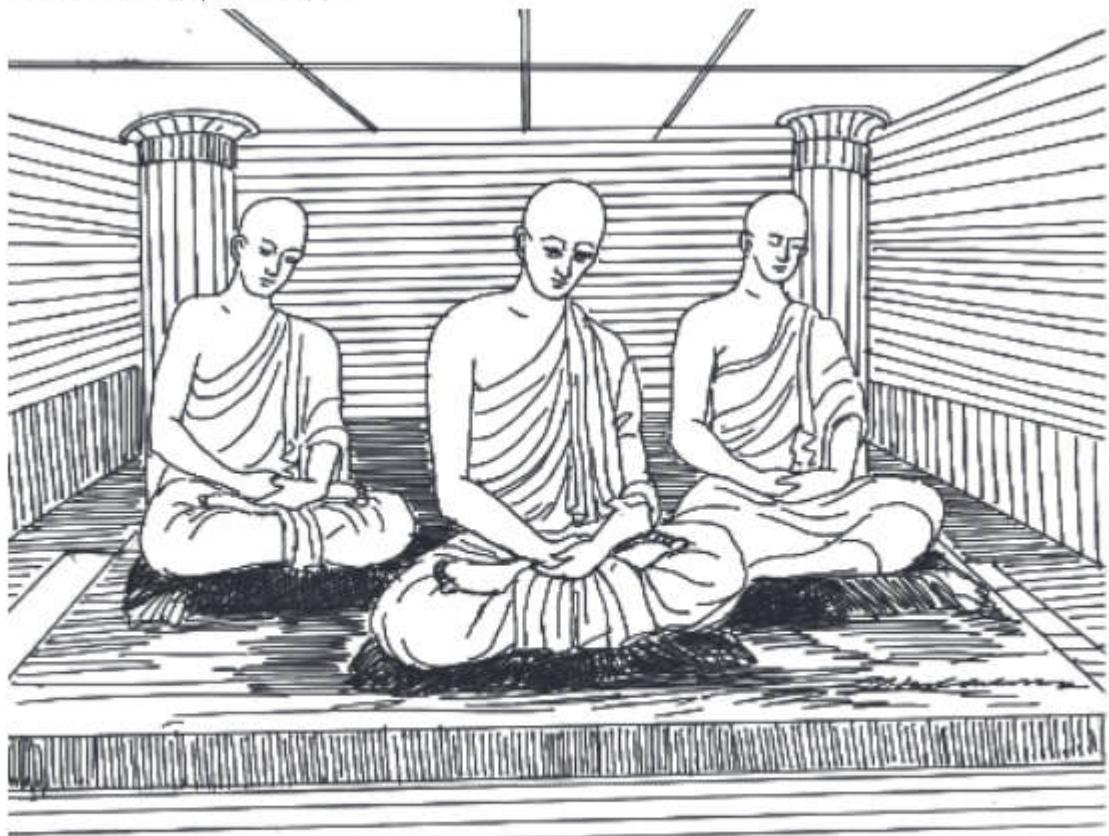
আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিই আষাঢ়ী পূর্ণিমা নামে খ্যাত। গৌতম বুদ্ধের জীবনের তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনা আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে সংঘটিত হয়েছিল। এগুলো হলো মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ, গৃহত্যাগ এবং প্রথম ধর্ম প্রচার।

কথিত আছে যে, এ শুভ পূর্ণিমা তিথির রাতে শাক্যরাজ্যের রানি মায়াদেবী একটি অপূর্ব স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্নে তিনি দেখেন যে, দেবতারা তাঁকে একটি মনোরম পালকে করে অনোবতঙ্গ হৃদের তীরে নিয়ে যান। কিছুক্ষণ পরই একটি সাদা হাতি ডান দিক দিয়ে তাঁর শরীরে একটি শ্বেতপদ্ম প্রবেশ করিয়ে দেয়। পরদিন রানি রাজা শুন্দেশাদনকে তাঁর সুন্দর স্বপ্নটি বর্ণনা করেন। রাজা শুন্দেশাদন জ্যোতিষীদের ডেকে স্বপ্নের কারণ জানতে চান। জ্যোতিষীরা বলেন, মহারাজ শীত্রাই পুত্রসন্তান লাভ করতে যাচ্ছেন এবং এই ভাবী পুত্রসন্তানই হবেন মহাজ্ঞানী বুদ্ধ। এ আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতেই সিদ্ধার্থ মাতৃজঠরে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন।

এমনই এক আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে সংসারের সকল ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে দুঃখমুক্তির পথ অঙ্গে অঙ্গে তিনি গৃহত্যাগ করেন। এ সময় সিদ্ধার্থ গৌতমের বয়স হয়েছিল উন্ত্রিশ বছর। রাজত্ব ও স্তুপুরের মাঝা ত্যাগ করে তিনি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। এ ঘটনাটি ‘মহাভিন্নক্ষমণ’ নামে বৌদ্ধ সাহিত্যে পরিচিত। মহাভিন্নক্ষমণ বলতে বুদ্ধের গৃহত্যাগকে বোঝায়।

বুদ্ধত্ব লাভের পর আরো এক আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে তিনি সারলাখে পঞ্চবগীয় শিষ্যদের মাঝে প্রথম ধর্ম প্রচার করেন। পঞ্চবগীয় শিষ্যরা হলেন : কোণ্গ্য, বঞ্চ, ভদ্রিয়, মহানাম ও অশ্বজিত। বুদ্ধের প্রচারিত প্রথম ধর্মবাণীকে বলা হয় ‘ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র’। জীবজগতের কল্যাণে তিনি আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে এই সূত্র দেশনা করেছিলেন। বুদ্ধের মহৎ জীবনের সূত্র বিজড়িত এই আষাঢ়ী পূর্ণিমা বৌদ্ধদের কাছে বিশেষ স্মরণীয় ও বরণীয় তিথি।

এ পূর্ণিমার সাথে আরো কিছু ধর্মীয় বিষয় সংযুক্ত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ১) আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতেই বুদ্ধ ভিক্ষুদের ত্রৈমাসিক বর্ষাবাসব্রত পালনের নির্দেশ দেন। তখন থেকে ভিক্ষুরা আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে কার্তিক পূর্ণিমা পর্যন্ত তিনি মাস বর্ষাব্রত পালন করে থাকেন। এ সময় তাঁরা ধর্ম-বিনয় অধ্যয়ন এবং ধ্যানচর্চায় রত থাকেন। সে সময় জরুরি কারণ ছাড়া কোনো ভিক্ষু নিজ বিহারের বাইরে রাত্রিযাপন করতে পারেন না। এটি ভিক্ষুদের বিনয় বিধান। ২) আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতেই বুদ্ধ পরলোকগত মাতা মায়াদেবীকে ধর্ম দেশনার জন্য তাবতিংস স্রগে গমন করেন। সেখানে তিনি তিনি মাস অবস্থান করেন এবং মাতা মায়াদেবী ও দেবতাদের নিকট অভিধর্ম দেশনা করেন। ৩) আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতেই তিনি যমক ঋকি প্রদর্শন করেন।



ভিক্ষুরা বিহারে ধ্যানচর্চারত

বুদ্ধপূর্ণিমার মতো, এ পূর্ণিমা তিথিতেও উপাসক উপাসিকাগণ বিহারে সমবেত হন। ভিক্ষুদের কাছ থেকে তাঁরা পঞ্চশীল ও অষ্টশীল গ্রহণ করেন। যাঁরা অষ্টশীল গ্রহণ করেন, তাঁরা ঐ দিন উপোসথ পালন করেন। এ সময় ভিক্ষুরা উপাসক—উপাসিকাদের উদ্দেশে ধর্ম দেশনা করেন। এতে গৃহীদের মধ্যে ধর্মতাব বৃদ্ধি পায়। এছাড়া একসাথে সম্মিলিত হয়ে ধর্ম শ্রবণ ও ধর্ম চর্চা করার কারণে নিজেদের মধ্যেই সৌহার্দ্য ও সম্মতি গড়ে উঠে এবং পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন সুন্দর হয়।

তোর থেকেই আঘাতী পূর্ণিমার উৎসব শুরু হয়। দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানে মুখর হয়ে উঠে বৌদ্ধবিহার। সম্মায় প্রদীপ পূজা, বুদ্ধকীর্তন এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হয় সমগ্র কর্মসূচি। অনেকে এ তিথিকে উপলক্ষ করে নিজ বাড়িতে বসে রাত পর্যন্ত বিদর্শন ভাবনা করেন। আবার অনেকে তিন দিন বা এক সপ্তাহের জন্য ধ্যান কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। এভাবে আঘাতী পূর্ণিমায় ধর্মীয় আচার—অনুষ্ঠান পালন করা হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

আঘাতী পূর্ণিমায় সংঘটিত বুদ্ধের জীবনের তিনটি ঘটনা বর্ণনা করো।

পাঠ : ৫

মধুপূর্ণিমা

দান, সেবা ও ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল মধুপূর্ণিমা তিথি। ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিকেই বলা হয় মধুপূর্ণিমা। এরূপ নামকরণের ক্ষেত্রে দানের একটি কাহিনি রয়েছে, যা বৌদ্ধ ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। একসময় বুদ্ধ কৌশাম্বিতে অবস্থান করছিলেন। সে সময় ভিক্ষুদের মধ্যে বিনয় সম্পর্কীয় একটি তুচ্ছ বিষয়কে কেন্দ্র করে কলহ—বিবাদের সৃষ্টি হয়। ক্রমে কলহের প্রভাব কৌশাম্বির সকল আবাসিক ভিক্ষুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এতে ভিক্ষুরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একসময় বিষয়টি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। বুদ্ধ সকল ভিক্ষুদের আহান করে কলহ—বিবাদ করা অনুচিত বলে বোঝাতে চেষ্টা করেন। রাগের বশবর্তী হয়ে কোনো বিষয়ে অনড় থাকা উচিত নয় বলে তিনি সকলকে জানান। এ উপদেশ প্রদানকালে বুদ্ধ তাদের দীর্ঘায় কুমারের কাহিনি বলেন। সে কাহিনিতে উল্লেখ আছে, কলহ ও রাগের প্রভাব জন্য জন্মান্তরে প্রবাহিত হয়। কিন্তু এতে উভয়ের ক্ষতি ছাড়া কোনো মঙ্গল হয় না। এমনকি শুধু কলহজনিত রাগের কারণে কোনো ভালো কাজও উপযুক্ত সময়ে করা যায় না। তাই সব সময় কলহ—বিবাদ পরিত্যাগ করা উচিত। বুদ্ধের নানাবিধ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কৌশাম্বিবাসী ভিক্ষুরা কলহ থেকে বিরত হলেন না। নিজেদের মধ্যে কলহ ত্যাগ করে প্রীতির সমর্পক তৈরি করতে পারলেন না।

তখন বুদ্ধকৌশাম্বিবাসী ভিক্ষুদের সংসর্গ ত্যাগ করে নিজে একাকী নির্জন গহিন বনে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। একসময় তিনি চলে গেলেন পারিল্যের নামক বনে। ভিক্ষুদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে তিনি সেখানে স্বচ্ছদে অবস্থান করতে লাগলেন। বুদ্ধ বনের মধ্যে একটি ভদ্রশাল গাছের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেখানে অবস্থান করছিল একটি হাতি। হাতিটি স্বতঃস্বর্তৃত্বাবে নিজের শুভ দিয়ে বুদ্ধের বসবাসের জায়গাটি পরিষ্কার করে দেয়। হাতিটি বুদ্ধের জন্য নিয়মিত পানীয় জলও সংগ্রহ করে আনত। সেবা দানের জন্য সব সময় তৎপর থাকত। এভাবে হাতিটি নিজের ইচ্ছাতেই বুদ্ধের সেবায় নিয়োজিত থাকত। বন্য প্রাণী হাতির এরূপ সেবাপ্রায়ণতা দেখে বনের এক বানরও বুদ্ধকে সেবা করতে আগ্রহী হয়। সেই চেতনায় বানরটি অত্যন্ত শুদ্ধাসহকারে বন থেকে মধু সংগ্রহ করে বুদ্ধকে দান করে। বুদ্ধ বানরের দেওয়া মধু সন্তুষ্টিতে গ্রহণ করেন। এতে বানর খুবই প্রীত হয়। মনের সুখে এক বৃক্ষ থেকে অন্য বৃক্ষে লাফাতে থাকে। বানরটি আনন্দে আত্মারা হয়ে লাফানোর সময় হঠাৎ মাটিতে পড়ে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। বুদ্ধ দিব্যচক্ষুতে দেখলেন যে, মধুদানের ফলে বানর মৃত্যুর পর দেবলোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছে। এ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল ভাদ্র পূর্ণিমা তিথিতে। এ অনন্য ঘটনাকে স্মরণ করে বৌদ্ধরা এ পূর্ণিমা তিথিতে ভিক্ষুসম্মেবলে মধু দান করে।

এসব কারণে তদ্ব পূর্ণিমাকে মধুপূর্ণিমা বলা হয়। এছাড়া কৌশাম্বির ভিক্ষুরাও নিজেদের ভূল বুঝতে পেরে কলহ ত্যাগ করেন এবং পারম্পরিক মধুময় সম্পর্ক সৃষ্টি করতে সমর্থ হন।



বানর বুদ্ধকে মধু দান করছে

এ পূর্ণিমায় যেসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়, তা প্রায় অন্যান্য পূর্ণিমা অনুষ্ঠানের মতো। মধু দান করা এ পূর্ণিমার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ তিথিতে বৌদ্ধরা বুদ্ধ ও ভিক্ষুদের উদ্দেশে মধু দান করে। বিহারে আগত উপাসক-উপাসিকারা পরস্পরকে মধু ও পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করে। এভাবে দান ও সেবার ঐতিহ্যকে ধারণ করেই মধু পূর্ণিমা পালন করা হয়।

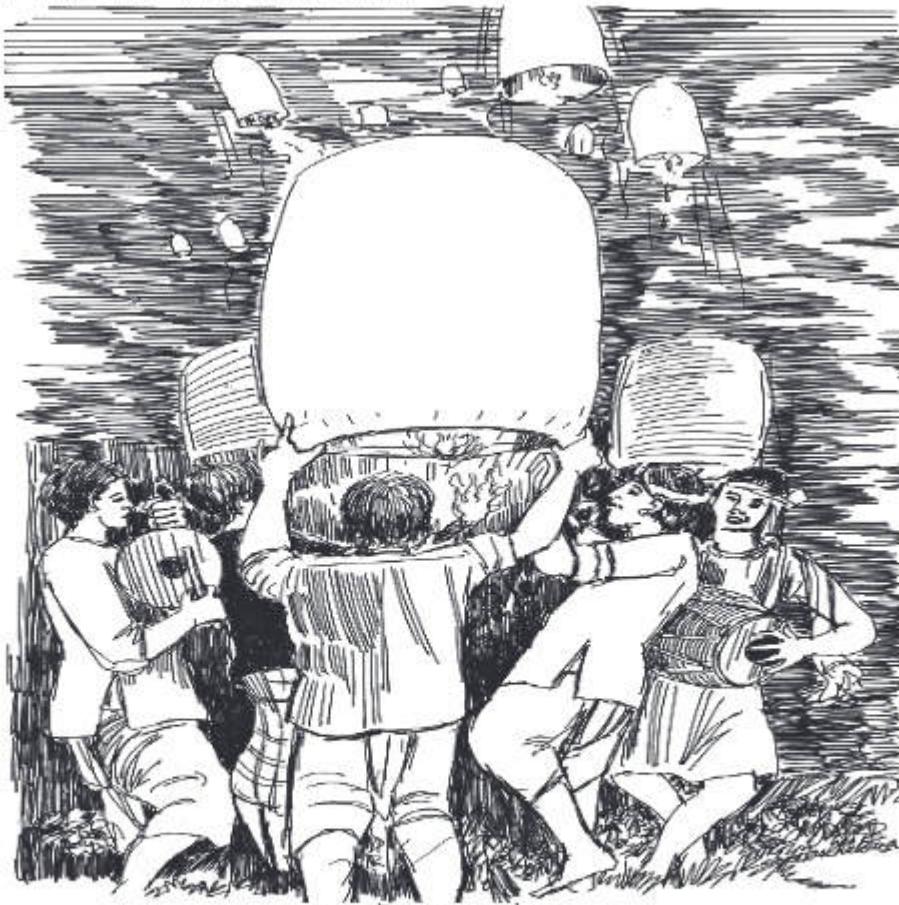
অনুশীলনমূলক কাজ
মধুপূর্ণিমার অন্যতম বৈশিষ্ট্য কী?

পাঠ : ৬

প্রবারণা পূর্ণিমা

প্রবারণা পূর্ণিমা আশ্বিন মাসে অনুষ্ঠিত হয়। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিই প্রবারণা পূর্ণিমা। অন্যান্য পূর্ণিমার মতো এ পূর্ণিমা তিথির সঙ্গেও বুদ্ধের জীবনের কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা জড়িত আছে। যেমন: এ পূর্ণিমা তিথিতেই বুদ্ধ মাতাকে এবং দেবতাদের অভিধর্ম দেশনা করে তাবতিঙ্স স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে ফিরে এসেছিলেন। এ পূর্ণিমা তিথিতে ভিক্ষুদের ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রত পালন সমাপ্ত হয়। এ পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধ ভিক্ষুদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, ‘ভিক্ষুগণ! বহুজনের মজাপের জন্য, হিতের জন্য তোমরা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ো। প্রচার করো সেই ধর্ম, যে ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং অন্তে কল্যাণ।’ এ পূর্ণিমাকে প্রবারণা পূর্ণিমা বলা হয়।

‘প্রবারণা’ শব্দের অর্থ হলো সন্তুষ্টি বা ইচ্ছার পূর্ণতা, উৎসব, বরণ করা, বারণ করা ইত্যাদি। কৃশ্লসমূহ প্রকৃষ্টরূপে বরণ করা এবং অকৃশ্লসমূহ বারণ করাই হচ্ছে প্রবারণা। বর্ধাবাস্ত্রতের সমাপ্তি এবং মাসব্যাপী কঠিন চীবরদান উৎসবের সূচনা করে বলে প্রবারণাকে বৌদ্ধদের আনন্দের দিনও বলা হয়।



ফানুস উন্নোলন অনুষ্ঠান

প্রবারণা পূর্ণিমা একটি উৎসবমুখর দিন। এদিনে ফানুস ওড়ানো হয়। বিশেষ করে ফানুস বানানোর জন্য পূর্ণিমা তিথির কয়েকদিন আগে থেকেই বৌদ্ধ গ্রামসমূহে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। সম্ভ্যায় প্রার্থনা ও প্রদীপ পূজার পর বৌদ্ধবিহারে ফানুস ওড়ানোর উৎসব শুরু হয়। অনেকে বাড়ির উঠানেও ফানুস উৎসবের আয়োজন করে। এ উৎসবে বৌদ্ধ-অবৌদ্ধ, আবাল বৃক্ষবনিতা সর্বস্তরের লোক উপস্থিত হয় এবং ফানুস ওড়ানো উপভোগ করে। নানা রকম বাদ্যবাজনার তালে তালে, সংকীর্তনের বাংকারে নেচে-গেয়ে বর্ণিল ফানুস আকাশে ওড়ানো হয়। রাতে এ দৃশ্য অপূর্ব মনে হয়। এভাবে প্রবারণা পূর্ণিমা অনুষ্ঠান সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়।

এ পূর্ণিমা উদ্যাপনে আমরা এই শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, প্রত্যেক মানুষকে সর্বদা নির্দোষ ও পবিত্র থাকার ইচ্ছা পোষণ করতে হবে। এজন্য চেষ্টা করতে হবে। যেমন: প্রবারণা পূর্ণিমায় বৌদ্ধভিক্ষুরা ভিক্ষুসীমায় বসে পরম্পরারের কাছে দোষ-ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। এটি হলো আত্মশুद্ধির প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে নিজের মন পবিত্র হয় এবং আত্মশক্তি বৃদ্ধি পায়। আমাদেরও দোষ-ত্রুটির জন্য পরম্পরার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। এতে সুসম্পর্ক সৃষ্টি হয়। মনের রাগ ও হিংসা দূর হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

প্রবারণা পূর্ণিমার দিন বৃক্ষ ভিক্ষুদের কী নির্দেশ দিয়েছিলেন?

পাঠ : ৭

মাঘী পূর্ণিমা

বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসবসমূহের মধ্যে মাঘী পূর্ণিমাও গুরুত্বপূর্ণ। এ পূর্ণিমার সঙ্গে বুদ্ধের জীবনের অনেক ঘটনা জড়িত আছে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মহাপরিনির্বাণ লাভের ঘোষণা। এ তিথিতে বৃক্ষ নিজের আয়ু সংক্ষার বিসর্জন বা মহাপরিনির্বাণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এই সময় তিনি বৈশালীর চাপাল চৈত্যে অবস্থান করছিলেন। তিনি ভিক্ষুসঞ্চাকে বলেছিলেন, ‘এখন হতে তিন মাস পর আগামী বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে আমি পরিনির্বাণ লাভ করব।’ এভাবে নিজের জীবন অবসানের দিনক্ষণ ঘোষণা করা সাধারণের জীবনে বিরল। জগতে হয়তো আর দ্বিতীয়টি নেই।

স্বাভাবিক দৃষ্টিতে বুদ্ধের জীবন অবসানের ঘোষণার জন্য এই দিনটি শোকের বা দুঃখের মনে হতে পারে। কিন্তু বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনের ভিত্তিতে বিবেচনা করলে এটি মহৎ ও মহান একটি দিন। কারণ বৃক্ষ বলেছেন, উৎপন্ন সকল কিছুরই বিনাশ অনিবার্য। অর্থাৎ জন্ম হলেই মৃত্যু হবে। জগতের সকল কিছুই অনিয়ত ও অনাত্মা নিয়মে বাঁধা। বৃক্ষ এই সত্যকে সাধনা ও প্রজ্ঞা দ্বারা আবিষ্কার করেছিলেন। নিজের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে তিনি সম্যক দৃষ্টিতে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই তিনি তাঁর আয়ু সংক্ষার ঘোষণা করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

অন্য সকল পূর্ণিমা উৎসবের মতো মাঘী পূর্ণিমার অনুষ্ঠানমালাও খুব সকাল থেকে শুরু হয়। এ অনুষ্ঠানে পঞ্চশীল ও উপোসথশীল গ্রহণ, বৃক্ষ পূজা, সমবেত উপাসনা, দেশ, জাতি ও বিশ্ববাসীর সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করা হয়। এছাড়া ধর্মালোচনা, সান্দ্যকালীন বন্দনা ও পূজা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি আয়োজন করা হয়।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করো।

১. যে অনুষ্ঠানগুলো চান্দ্ৰবছরের নিয়মে অনুষ্ঠিত হয় সেগুলো ধৰ্মীয় বা
২. 'কঠিন চীবৰদান' অনুষ্ঠান কৰতে হয় বছরের নির্দিষ্ট
৩. বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিই নামে খ্যাত।
৪. ভিক্ষুসঙ্গকে দুপুরের আহার দান কৰাকে বলে।
৫. ভাদ্র মাসের পূর্ণিমা তিথিকেই বলা হয়

মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. বৌদ্ধধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো	ধৰ্মচক্র প্ৰবৰ্তন সূত্ৰ।
২. সকলের একাথচিত্তে	জীবনের সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য।
৩. প্ৰকৃতিৰ সাথে আমাদেৱ	মহারাজ শীঘ্ৰই পুত্ৰ সন্তান লাভ কৰতে যাচ্ছেন।
৪. জ্যোতিষীৱা বলেন	প্ৰধানত পূর্ণিমাকেন্দ্ৰিক।
৫. বুদ্ধেৰ প্ৰচাৱিত প্ৰথম ধৰ্মবাণীকে বলা হয়	ধৰ্মীয় আচাৱ-অনুষ্ঠান পালন কৱা উচিত।

সংক্ষিপ্ত-উত্তৰ প্ৰশ্ন

১. কোন মাসের পূর্ণিমা তিথিকে মধু পূর্ণিমা বলা হয়?
২. বুদ্ধ পূর্ণিমা কোন মাসে কীভাৱে অনুষ্ঠিত হয়?
৩. ফানুস উত্তোলন উৎসবেৰ পৰিচয় দাও।
৪. প্ৰবাৱণা পূর্ণিমাৰ দিন বুদ্ধ ভিক্ষুদেৱ কী নিৰ্দেশ দিয়েছিলেন?

বৰ্ণনামূলক প্ৰশ্ন

১. বৌদ্ধধর্মীয় অনুষ্ঠান ও উৎসবেৰ পৰিচয় লিপিবদ্ধ কৱো।
২. বুদ্ধ পূর্ণিমা উদ্যাপনেৰ কাৱণসমূহ বৰ্ণনা কৱো।
৩. প্ৰবাৱণা পূর্ণিমাৰ শিক্ষা আমাদেৱ জীবনে যে যে উন্নয়ন আনতে পাৱে তা আলোচনা কৱো।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গৌতম বুদ্ধের জীবনে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে কয়টি ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল?

ক. ২

খ. ৩

গ. ৪

ঘ. ৫

২. ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো সর্বজনীন হয় কেন?

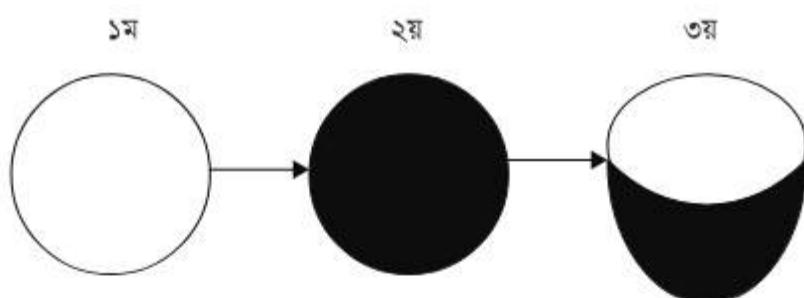
ক. আত্ম বন্ধনের জন্য

খ. সবার সাথে দেখা করার জন্য

গ. একতাবন্ধ হওয়ার জন্য

ঘ. পারম্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য

নিচের মডেলগুলো দেখ এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:



চিত্র : সময়ের ভিত্তিতে চাঁদের প্রকৃতি

৩. ১ম মডেলটি কী ইঙ্গিত বহন করছে?

ক. পূর্ণিমার

খ. কৃষ্ণ অঘোষীর

গ. শুক্রা অঘোষীর

ঘ. অমাবস্যার

৪. ৩য় মডেলের আলোকে গৃহীরা অনেকে কী করে থাকে?

ক. ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন

খ. অঘোষীল গ্রহণ ও পালন

গ. তীর্থস্থান দর্শন

ঘ. ধর্মীয় আলোচনা

সংজনশীল প্রশ্ন

১.

ঘটনা-১

তিকুরা এক পূর্ণিমা তিথিতে বর্ষাবৃত্ত পালনের জন্য বিহারে সমবেত হলেন। তাঁরা সম্মিলিতভাবে বুদ্ধ পূজা ও উপাসনার মাধ্যমে উপোসথ শীল গ্রহণ করেন। দুপুরে ধ্যান সমাধির চর্চা করেন। ধর্মদেশনার একপর্যায়ে ভস্তে বলেন, এ পূর্ণিমা তিথিতেই সিদ্ধার্থ মাতৃজঠরে প্রতিসমিতি গ্রহণ, গৃহত্বাগ ও সারনাথে ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করেন।

ঘটনা-২

বাবাকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাজরী মার্মা একদিন সন্ধিয়ায় ফানুসবাতি উত্তোলন অনুষ্ঠানে যোগদান করে। কৌতুহলবশত সে তার বাবার কাছে জানতে চাইল, বুদ্ধের জীবনের কোন ঘটনা এ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত। উভরে বাবা বলেন, এ তিথিতে বুদ্ধ মাতাকে এবং দেবতাদের অভিধর্ম দেশনা করে তাবতিংস স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। এছাড়া উক্ত দিবসে ভিক্ষুদের বর্ষাবাস পালন সমাপ্ত হয়।

ক. বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণের কথা কোন পূর্ণিমায় ঘোষণা করেন?

খ. বানরের মধুদানের ঘটনাটি উল্লেখ করো।

গ. ঘটনা-১ -এর সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন পূর্ণিমার ইঙ্গিত বহন করে। ব্যাখ্যা করো।

ঘ. ঘটনা-২ 'প্রবারণা পূর্ণিমার প্রতিচ্ছবি' -তুমি কি এর সঙ্গে একমত? যুক্তি প্রদর্শন করো।

২.

অনিবার্য বড়ুয়া একজন চাকরিজীবী। ছুটির দিনের এক সকালে বিহারে গিয়ে তিনি সূত্রপাঠ ও বুদ্ধ কীর্তনের মাধ্যমে প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করেন। পরে বুদ্ধ পূজা প্রদান করে পঞ্চশীল গ্রহণ করেন। দুপুর বারোটার আগে ভিক্ষুসঙ্গকে পিণ্ডান করেন এবং বিকালে ধর্মসভায় বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ ও মহাপরিনির্বাণ তিনটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের আলোচনা হয়।

ক. প্রবারণা শব্দের অর্থ কী?

খ. মাঝী পূর্ণিমার গুরুত্ব বর্ণনা

গ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়ের সাথে কোন পূর্ণিমার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. অনিবার্য বড়ুয়া উক্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করে কী সুফল লাভ করবে?
পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

অষ্টম অধ্যায়

চরিতমালা

মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী। কেউ চিরদিন এ জগতে বেঁচে থাকেন না। মানুষের কমই মানুষকে অমরত্ব দান করে। পৃথিবীতে যুগে যুগে অনেক স্মরণীয় ও বরণীয় মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের আলোয় জগৎ আলোকিত হয়েছে। এজন্য মানুষ তাঁদের শৃঙ্খলা করে, সম্মান করে এবং ভক্তি করে। তাঁদের নির্মল চরিত্র সহজেই মানুষের হন্দয় জয় করে নেয়। জ্ঞানে, গুণে ও কর্মে তাঁরা মহান। এ সকল মহৎ ব্যক্তির জীবন সকলের অনুকরণীয়। মহৎ মানুষের জীবনকথা সৎ জীবন যাপনের প্রেরণা এ অধ্যায়ে আমরা কয়েকজন থের-থেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীদের জীবনী পড়ব এবং তাঁদের অবদান সম্পর্কে জানব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- * জীবনচরিত পাঠের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব;
- * থের-থেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীদের পরিচয় দিতে পারব।

পাঠ : ১

জীবনচরিত পাঠের প্রয়োজনীয়তা

মহৎ ও আদর্শসম্পন্ন জীবনচরিত মানুষকে আকৃষ্ট করে। আদর্শিক জীবন গঠনে প্রেরণা জোগায়। বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে একাপ জীবন অর্জিত হয়। থের-থেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীদের জীবনচরিতে এই শিক্ষা পাওয়া যায়। এতে অনেক অনুশীলনীয় বিষয় রয়েছে, যা সকল শ্রেণি-পেশা ও বয়সের মানুষকে সৃষ্টিশীল কল্যাণ চেতনায় উদ্বৃদ্ধ করে।

জগতে সহজে কিছু লাভ করা যায় না। একাগ্রতা, অধ্যবসায়, ত্যাগ ও সংযম ছাড়া মহৎ জীবন গঠন করা সম্ভব নয়। চরিত্রের এই গুণগুলো জীবনের গতির সাথে ধীরে ধীরে অর্জন করতে হয়। থের-থেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীদের জীবনচরিত পাঠে দেখা যায়— তাঁদের জীবনেও সুখ, দুঃখ, হাসি-কান্না ও বেদন ছিল। কিন্তু তাঁরা কখনো আনন্দে বিভোর ও দুঃখে বিমর্শ হয়ে আদর্শচূর্ত হননি। নৈতিক মূল্যবোধ রক্ষাই ছিল তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। তাঁরা ছিলেন মহৎ ও মহানুভব। আমাদের জীবনও সুন্দরভাবে গঠন করার লক্ষ্যে তাঁদের জীবনী পাঠের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এগুলো পাঠের মাধ্যমে আমাদের আদর্শিক চেতনা ও নৈতিকবোধ আরো সমৃদ্ধ হবে। তাই থের-থেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীদের জীবনচরিত পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন।

ত্রিপিটক সাহিত্যে অনেক নারী-পুরুষের জীবনী পাওয়া যায়, যারা কর্মগুণে অরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী হয়েছেন। ভিক্ষুদের থের আর ভিক্ষুণীদের থেরী বলা হয়। বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে তাঁদের অনেক অবদান রয়েছে। থেরদের মধ্যে উপাসি ও আনন্দ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। থেরীদের মধ্যে মহাপ্রজাপতি গৌতমী, কৃশাগৌতমী, ক্ষেমা বিশেষভাবে অরণীয়। এছাড়া অনেকে গৃহীজীবন যাপন করে বৌদ্ধধর্মের সেবা করেছেন। ধর্ম প্রচার করতে সাহায্য করেছেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে তাঁরা বিশিষ্ট বৌদ্ধ উপাসক নামে খ্যাত। এঁদের মধ্যে রাজা বিমিসার, অজাতশত্রু, অনাথপিণ্ডিক, বিশাখা, সুজাতা, মল্লিকা প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

অনুশীলনমূলক কাজ
কয়েকজন বৌদ্ধ থের-থেরীর নাম লেখো।

পাঠ : ২

উপালি থের

উপালির জন্ম কপিলাবস্তুর নিম্নকূলের নাপিত বৎশে। তাঁর গৃহী নাম ছিল পূর্ণ। তাঁর মাতার নাম ছিল মতানী। পূর্ণ ছিলেন অনুগ্রাহ্য, ভূগু, কেশ্বিল, ভদ্রীয়, আনন্দ, দেবদণ্ড প্রমুখ রাজপুত্রের সহচর।

বুধ এক সময়ে অনুগ্রাহ্য নামক স্থানের আম্ববনে অবস্থান করছিলেন। সে সময় কয়েকজন রাজপুত্র ঠিক করলেন তাঁরা একত্রে বুদ্ধের নিকট গিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবেন। এই ভেবে একদিন তাঁরা বুদ্ধের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। পূর্ণও তাঁদের সঙ্গী হলেন। কপিলাবস্তু থেকে কিছু দূরে এসে তাঁরা থামলেন। তারপর সকলে নিজেদের মূল্যবান পোশাক খুলে পূর্ণের হাতে তুলে দিলেন। তাঁরা বললেন, ‘পূর্ণ! এসব তোমাকে দিলাম। তুমি কপিলাবস্তুতে ফিরে যাও।’ এ বলে রাজপুত্ররা চলে গেলেন। পূর্ণ তখন ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেলেন। তাবতে লাগলেন, কপিলাবস্তুতে ফিরে গিয়ে রাজপুত্রদের সংসার ত্যাগের কথা কীভাবে জানাবেন? তিনি আরও তাবলেন, নাপিত বৎশে আমার জন্ম। এই মূল্যবান পোশাক আমার উপযুক্ত নয়। তাছাড়া তাঁরা রাজপুত্র। তাঁদের বিপুল অর্থ, ধনসম্পদ, প্রভাব ও প্রতিপত্তি আছে। এসব ছেড়ে তাঁরা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারলে আমি কেন পারব না? আমার তো কিছুই নেই। এ বলে তিনি মূল্যবান পোশাকগুলো একটি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে



রাজপুত্রের পূর্ণকে পোশাক ও অলংকার খুলে দিচ্ছেন

রাজকুমারদের পথে পা বাঢ়ালেন। ইতোমধ্যে অনুরূপ, ভূগু, আনন্দ প্রযুক্তি রাজকুমারগণ বুদ্ধের কাছে গিয়ে প্রব্রজ্যাধর্মে দীক্ষিত হওয়ার প্রার্থনা জানালেন। এমন সময় পূর্ণও এসে বুদ্ধকে বস্তনা করে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করলেন। তখন রাজকুমারগণ বুদ্ধকে অনুরোধ করে বললেন, ‘তত্ত্বে! আগে পূর্ণকে প্রব্রজ্যা দিন। তাহলে তাকে আমরা প্রণাম ও সম্মান করতে বাধ্য হবো। এতে আমাদের বশমর্যাদা ও অহংকার দূর হবে।’

তাঁদের অনুরোধ শুনে বুদ্ধ খুশি হলেন। বুদ্ধ প্রথমে পূর্ণকে এবং পরে রাজকুমারদের প্রব্রজ্যা দান করেন। প্রব্রজ্যা প্রহণ করার পর পূর্ণের নাম হয় উপালি।

প্রব্রজ্যা প্রহণের কয়েক দিন পরই উপালি বুদ্ধের নিকট অরণ্যে বসবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু বুদ্ধ তাঁকে বুদ্ধের সঙ্গে থেকে ধর্ম বিনয় অনুশীলন করতে বললেন। উপালি বুদ্ধের উপদেশ অনুসরণ করে অতি অল্প সময়ে অর্হত ফল লাভ করতে সমর্থ হলেন। বুদ্ধের সঙ্গে থেকে উপালি বিনয়ে পারদর্শিতা অর্জন করেন। বিনয়ে দক্ষতা দেখে বুদ্ধ তাঁকে ‘বিনয়ধর’ (নীতিজ্ঞানে সর্বশ্রেষ্ঠ) বলে ঘোষণা করেন।

একদিন উপোসথ দিবসে প্রাতিমোক্ষ আবৃত্তিকালে উপালি ভিক্ষুদের নিম্নরূপ উপদেশ দান করেন, ‘প্রথম শিক্ষার্থী নব প্রবৃজিত কর্মফল ও রাত্ত্বায়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে গৃহ হতে বের হয়ে শুল্ক জীবন যাপনকারী, শৌর্ববান কল্যাণমিত্রের নিকট উপস্থিত হবেন। সঙ্গের মধ্যে বাস করবেন। জ্ঞানী ভিক্ষু বিনয় শিক্ষা করবেন। যোগ্য অযোগ্য বিষয়ে সুদক্ষ হবেন এবং তৃষ্ণা উৎপাদন না করে বাস করবেন।’

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর আয়োজিত প্রথম মহাসঙ্গীতিতে উপালি বিনয় আবৃত্তি করেন। সেই মহাসঙ্গীতিতে পাঁচশত মহাজ্ঞানী অর্হৎ ভিক্ষু উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা উপালির আবৃত্তি করা বিনয়ের যথার্থতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। পরে এগুলো বিনয়পিটক নামে সংকলিত করা হয়। বুদ্ধ প্রদত্ত বিনয়ধর অভিধার মর্যাদা রাখতে তিনি সম্মত হয়েছেন। এটি তাঁর জীবনের পরম গৌরব। প্রচেষ্টা ও অধ্যবসায় ধারকলে মানুষের জীবনে অনেক কিছু করা সম্ভব। এর জন্য বশমর্যাদার প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন সৎ কর্ম করার প্রচেষ্টা। উপালি থের র জীবনী থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই।

অনুশীলনমূলক কাজ

উপালির সঙ্গে ধাঁরা প্রব্রজ্যা লাভ করেছিলেন, তাঁদের নামগুলো লেখো (দলীয় কাজ)।

পাঠ : ৩ আনন্দ থের

আনন্দের জন্ম শাক্যরাজ বংশে। তিনি রাজকুমার সিদ্ধার্থের কাকাতো ভাই ছিলেন। তাঁর পিতার নাম অমিতোদন। সিদ্ধার্থ ও আনন্দ একই দিনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অনুরূপ, ভূগু, ভদ্রীয় ও অন্যান্য শাক্য রাজকুমারদের সাথে তিনি একই দিনে বুদ্ধের কাছে প্রব্রজ্যা প্রহণ করেন। আনন্দ সুপ্রবৃষ্ট ছিলেন। তিনি বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য ছিলেন এবং আটটি শর্তের মাধ্যমে বুদ্ধের প্রধান সেবকের পদ লাভ করেছিলেন। তিনি তালো বক্তা ছিলেন। দৈহিক সৌন্দর্য ও সুন্দর ব্যবহারের জন্য সকলেই তাঁকে ভালোবাসতেন।

বুদ্ধের বয়স যখন ৫৫ বছর, তখন তাঁর একজন স্থায়ী সেবকের দরকার হয়। সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ান এবং আনন্দসহ অনেকেই বুদ্ধের সেবক হতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। বুদ্ধ জানতেন, আনন্দ কম্বকাল ধরে এই পদের জন্য পুঁজি সংগ্রহ করে আসছেন। আনন্দ তখন মাত্র স্নোতাগতি ফল লাভ করেছিলেন। বুদ্ধ তাই আনন্দ থেরকে সেবক পদে নিযুক্ত করেন। সেদিন থেকে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভ পর্যন্ত আনন্দ সব সময় বুদ্ধের সঙ্গে ছিলেন। তথাগত বুদ্ধ আনন্দকে সম্মোধন করে ভিক্ষুসঙ্গের উদ্দেশ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দিয়েছেন।

এসব উপদেশ ‘মহাপরিনির্বাণ’ সূত্রে পাওয়া যায়। আনন্দ থের অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বুদ্ধের সেবা করতেন। বুদ্ধ যখন উপদেশ দিতেন, তিনি অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনতেন। সব উপদেশ মনে রাখতেন। তাঁর অৃতিশক্তি ছিল খুবই প্রথর। তিনি বুদ্ধের যেকোনো উপদেশ প্রয়োজনে হ্রবহু অন্যকে বলতে পারতেন। এ জন্য তিনি ‘ধর্মভান্ডারিক’ ও ‘শুতিধর’ ডিক্ষু নামে খ্যাত হন।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের অঙ্গকাল পরেই রাজগৃহের সঞ্চপর্ণ গুহায় প্রথম মহাসজ্জীতি অনুষ্ঠিত হয়। মহাসজ্জীতিতে একমাত্র অর্হৎ ভিক্ষুদেরই প্রবেশাধিকার ছিল। তবে বুদ্ধের সেবক ও শুতিধর হিসেবে আনন্দের জন্য একটি আসন সংরক্ষিত ছিল। এ আমন্ত্রণ পেয়ে আনন্দ মহাসজ্জীতির পূর্বরাতে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হলেন। সেই রাতেই তিনি অর্হত্ব ফলে উন্নীত হন। অর্হত্ব লাভ করে তিনি ভিক্ষুদের অনেক উপদেশ প্রদান করেন। নিম্নে দুটি উপদেশ তুলে ধরা হলো :

১. কর্কশ বাক্যভাষী, ক্রোধী, অহংকারী এবং সংঘত্তেদকারী ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে না,

তাদের সঙ্গী হওয়া উচিত নয়।

২. শ্রব্যাবান, শীলবান, জ্ঞানবান ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে। তাঁদের সঙ্গ উন্নত।

এদিকে মহাসজ্জীতি উপলক্ষে সম্মেলনকক্ষে সকল অর্হৎ ভিক্ষু সমবেত হন। শুধু আনন্দ থের ছিলেন অনুপস্থিত। মহাসজ্জীতি শুরু হলো। হঠাত সকলেই দেখলেন আনন্দ তাঁর আসনে বসে আছেন। সকলের মন খুশিতে ভরে উঠল। কথিত আছে, তিনি আকাশপথে এসে তাঁর জন্য রাখা নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম মহাসজ্জীতিতে আনন্দ ধর্ম (সূত্র ও অভিধর্ম) আবৃত্তি করেছিলেন।

ভিক্ষুনী সংজ্ঞ প্রতিষ্ঠায় আনন্দের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। মহারাজ শুদ্ধেদনের মৃত্যুর পর মহাপ্রজাপতি গৌতমী বুদ্ধের কাছে গিয়ে প্রবৃজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু বুদ্ধ প্রথমে এতে সম্মত হননি। পরে আনন্দের প্রবল অনুরোধে নারীদেরও সংজ্ঞ প্রবেশাধিকার অনুমোদন করেন। সে সময়ে নারীদের ভিক্ষুনী পদের মর্যাদা প্রদান করা খুবই কঠিন ছিল। নারীদের গৃহে থাকাই ছিল সামাজিক প্রথা। তাই বলা হয়, মাতৃজাতিকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে মর্যাদাপূর্ণ স্থানে প্রতিষ্ঠিতকরণে আনন্দ থের র ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

অনুশীলনমূলক কাজ

আনন্দ থের র দুটি উপদেশ লেখো।

পাঠ : ৪

কৃশা গৌতমী থেরী

বুদ্ধের সময়ে কৃশা গৌতমী শ্রাবণী নগরের এক গরিবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম ছিল গৌতমী। তাঁর দেহ অত্যন্ত কৃশ হওয়ায় তিনি কৃশা গৌতমী নামে অভিহিত হন। তাঁর বিবাহিত জীবনে তিনি সুখ লাভ করতে পারেননি। অনাদর-অবহেলায় কেটেছে তাঁর জীবন। ভসময়ে তাঁর স্বামীও মৃত্যুবরণ করেন। গোকে তাঁকে অনাথা বলত। কিন্তু এক পুত্রসন্তান প্রসব করে তিনি সম্মান লাভ করেন। পুত্রটি ছিল তাঁর একমাত্র আশা-ভরসা। পুত্রটি বড় হয়ে তুমে কৈশোরে উন্নীর্ণ হলে হঠাত তারও মৃত্যু হয়। পুত্রের মৃত্যুতে তিনি শোকে পাগল হয়ে যান। একমাত্র পুত্রের মৃত্যু তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। সকলের কাছে মৃত সন্তানকে বাঁচানোর জন্য ঔষধ ভিক্ষা চাইলেন। ঔষধ কেউ দিতে পারলেন না। বরং নগরবাসী কেউ কেউ তাঁকে পাগল বলে ভৎসনা করলেন। কৃশা গৌতমী কারো কথাতেই জ্ঞানে করলেন না। সন্তানকে বাঁচানোর আশায় তিনি ছুটে চললেন প্রত্যেকের দুয়ারে দুয়ারে। অবশেষে এক মহৎ ব্যক্তি তাঁকে তথাগত বুদ্ধের



মৃত ছেলেকে কোলে নিয়ে কৃশা গৌতমী বুদ্ধের কাছে আসছেন

কাছে গিয়ে ঔষধ প্রার্থনা করতে বললেন। অতঃপর কৃশা গৌতমী মৃত সন্তান কোলে নিয়ে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে তিনি বুদ্ধকে বললেন, ‘ভগবান! আমার সন্তানের জন্য ঔষধ দিন।’ বুদ্ধ কৃশা গৌতমীর দিকে তাকালেন এবং ধ্যান চেতনায় দেখলেন কৃশা গৌতমীর পূর্বজন্মের অনেক সুকৃতি আছে। কিন্তু এ জন্মের নানাবিধি কর্ম ও কর্মফলে তার হৃদয় কফে তরপুর। বুদ্ধ তার মানসিক অশান্তি দূর করার জন্য তাঁকে বললেন; ‘নগরে গিয়ে এমন একটি ঘর থেকে সরিষাবীজ নিয়ে এসো, যে ঘরে কখনো কোনো মানুষের মৃত্যু হয়নি।’ বুদ্ধের কথা শুনে কৃশা গৌতমী কিছুটা শান্ত হন এবং মৃত পুত্রকে বুকে নিয়ে তিনি নগরে প্রবেশ করেন। তিনি প্রতিটি ঘরের দরজায় গিয়ে সরিষাবীজ ভিক্ষা করে জিজ্ঞেস করলেন, এই ঘরে কোনো মৃত্যু ঘটেছে কি না। সকল ঘরে একই উন্নত পেল, এখানে কত মৃত্যু হয়েছে তার ইয়ন্তা নেই। তিনি বুঝতে পারলেন, কোনো ঘরই মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে মৃত্যু নয়। ‘জন্ম হলেই মৃত্যু অনিবার্য। সর্ব বস্তু অনিত্য।’ অতঃপর পুত্রের সঁকার করে তিনি বুদ্ধের নিকট ফিরে যান। বুদ্ধ জিজ্ঞসা করেন, ‘গৌতমী! সরিষাবীজ পেয়েছ কি? কৃশা গৌতমী বললেন, ‘ভগবান! সরিষাবীজের আর প্রয়োজন নেই। আমাকে দীক্ষা দিন।’ তখন বুদ্ধ তাকে বললেন, ‘বন্যার স্নোত যেমন গ্রাম, নগর ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি ভোগবিলাসে রত মানুষও মৃত্যুর মাধ্যমে ধ্বংস হয়ে যায়।’ বুদ্ধের উপদেশ শুনে কৃশা গৌতমী স্নোতাপন্তি ফল লাভ করে ভিক্ষুণীধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তিনি খুব ভালোভাবে ভিক্ষুণী জীবনের নিয়ম পালন করেন। সকল প্রকার লোভ, হিংসা, মোহ, ত্যক্তি ক্ষয় করে তিনি অর্হতপ্রাপ্ত হন। বুদ্ধ তাঁকে অমসৃণ বন্ধ পরিধানকারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করেন। স্বীয় সাফল্যে উল্লিঙ্কিত হয়ে তিনি অনেক গাথা ভাষণ করেছিলেন।
তাঁর কিছু উপদেশ নিচে তুলে ধরা হলো :

- ১) সাধু ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করা জ্ঞানীগণ প্রশংসা করেন। সাধু ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে জ্ঞানী হওয়া যায়।

- ২) সৎ মানুষের অনুসরণ করো। এতে জ্ঞান বৰ্ধিত হয়।
- ৩) চতুরার্থ সত্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করো।
- ৪) আমি আর্য অক্টাঙ্গিক মার্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি, নির্বাণ উপলব্ধি করেছি।
- ৫) আমি বেদনা মৃত্ত, ভার মৃত্ত। আমার চিত্ত সম্পূর্ণ মৃত্ত।

অনুশীলনমূলক কাজ

কৃশা গৌতমী কীভাবে বুঝলেন যে সকলে মৃত্যুর অধীন? বর্ণনা করো।

পাঠ : ৫

অভিজ্ঞপা নন্দা

হিমালয়ের পাদদেশে ছিল কপিলাবস্তু রাজ্য। এই রাজ্যে শাক্য জাতি বাস করত। সিদ্ধার্থ গৌতমের পিতা শুক্রেশ্বর ছিলেন শাক্যদের রাজা। শাসনকার্য পরিচালনায় সুবিধার জন্য রাজ্যটি বচেকজন নায়কের অধীন বিভক্ত ছিল। তেমনি এক নায়ক ছিলেন ফ্রেমক। নন্দা ছিলেন ফ্রেমকের প্রধান স্তুর কন্যা। নন্দা অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন। তাই তাঁর নাম হয় অভিজ্ঞপা নন্দা।

নন্দা বিবাহযোগ্য হলে বহু ধনী ব্যক্তির পুত্র বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। অনেক বিচার-বিবেচনা করার পর নন্দা এক শাক্য যুবককে পছন্দ করলেন। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য! সেই দিনই সেই শাক্য যুবকের মৃত্যু হয়। সমাজে তখন তা অমজ্ঞাল হিসেবে বিবেচিত হতো। নন্দার মা-বাবা ও ভীষণ মর্মাহত হন। তাঁরা ঠিক করলেন নন্দাকে সংসারধর্মে আবদ্ধ না রাখতে। অশুভ প্রভাব থেকে মুক্তির জন্য তাঁকে প্রবর্জিত করলেন। প্রবর্জিত হলেও নন্দা তাঁর রূপের জন্য খুব অহংকার করতেন। মন্তক মৃত্যুভূতি করে ভিক্ষুণীর বেশ গ্রহণে তাঁর বিদ্যুমাত্র আগ্রহ ছিল না। কিন্তু পরিবারের সিদ্ধান্তে বাধ্য হয়ে নন্দা প্রবৃজ্যা গ্রহণ করলেন।

প্রবৃজ্যা গ্রহণের পর নন্দার নতুন জীবন শুরু হলো। নন্দা এখন ভিক্ষুণী। কিন্তু ভিক্ষুণী হলেও তিনি রূপের অহংকার করতেন। উপদেশ শোনার জন্য প্রতিদিন অনেক ভিক্ষুণী বুদ্ধের নিকট যেতেন। কিন্তু নন্দা বুদ্ধের সামনে যেতে ভয় পেতেন। কারণ তিনি মনে করতেন, বুদ্ধ তাঁর মনোভাব জেনে তাঁকে সকলের সামনে ভর্তুসনা করতে পারেন। এই ভয়ে তিনি সবসময় বুদ্ধকে এড়িয়ে চলতেন। বুদ্ধ জানতেন, নন্দা জ্ঞান লাভের উপযুক্ত। তিনি নন্দাকে ডেকে আনেন। সে সময় বুদ্ধ দিব্যশক্তিতে নন্দার চেয়ে অপরূপ সুন্দরী নারীকে উপস্থিত করেন। সে নারীর সৌন্দর্য দেখে নন্দা হতভস্য হয়ে যান। এক দৃষ্টিতে নন্দা চেয়ে রইলেন সেই সুন্দরী নারীর দিকে। বুদ্ধ দিব্যশক্তিতে সুন্দরী নারীকে পুনরায় বৃদ্ধ, জরা, শীর্ণ অবস্থায় পরিণত করলেন। সেই দৃশ্য নন্দার মনে আঘাত করল। তাঁর রূপের মিথ্যা অহংকার নিমেষেই ধ্বংস হয়ে গেল। তখন বুদ্ধ তাঁকে অহংকার পরিত্যাগ করার জন্য উপদেশ দেন। বুদ্ধের উপদেশ শুনে তিনি বুঝতে পারলেন; রূপ ক্ষণস্থায়ী, অন্তরের সৌন্দর্যই চিরস্থায়ী। অতঃপর তিনি তৃষ্ণামৃত হয়ে অর্হতপ্রাপ্ত হন এবং উপদেশস্বরূপ বলেন; ‘এই দেহ অশুচি এবং ব্যাধির আগ্নয়। এতে অহংকারের কিছুই নেই। অনিষ্টকর অহংকার পরিত্যাগ করো। মনকে শান্ত ও সংযত করো।’

নন্দার জীবনী থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে রূপের জন্য অহংকার করা উচিত নয়। সৎ জ্ঞানই মানুষের পরম সম্পদ।



ধ্যানস্থ ভিক্ষুনী অভিনন্দা নন্দা

অনুশীলনমূলক কাজ

কল্প ক্ষণস্থায়ী – বুদ্ধ অভিনন্দা নন্দাকে কীভাবে এ শিক্ষা দিলেন? বর্ণনা করো।

অর্হত্বাঙ্গ হয়ে অভিনন্দা নন্দা কী বলেছিলেন?

পাঠ : ৬

অতীশ দীপঙ্কর

যুগে যুগে বাংলাদেশে বহু জ্ঞানী পত্তি ও মনীষী জন্মাই হই করেছেন। তাঁরা নিজ গুণে বিশ্বের ইতিহাসে শৃদ্ধার আদল লাভ করেছেন। অমর হয়ে আছেন মানুষের মনের মধ্যে। সেই রকম এক মনীষী অতীশ দীপঙ্কর। অতীশ দীপঙ্কর বাংলাদেশের লোক ছিলেন। ৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে প্রাচীন ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগনার বজ্রযোগিনী থামে তাঁর জন্ম। এটি বর্তমানে ঢাকা বিভাগের মুকিগঞ্জ জেলার অন্তর্গত। অতীশের বাস্তুভিটাটি এখনও বিদ্যমান।



অতীশ দীপঙ্কর

বজ্রযোগিনীর সেই ঐতিহাসিক স্থানটিতে অতীশ দীপঙ্করের নামে একটি স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এটি করেছে ‘বাঙাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্ণ প্রচার সংঘ’ নামক একটি সংগঠন। চীনসহ অনেক দেশ থেকে অনেক লোক এই বাস্তুভিটাটি দেখতে আসেন।

অতীশের পিতার নাম ছিল কল্যাণশ্রী। মাতার নাম প্রভাবতী। জন্মের পর মা-বাবা আদর করে তাঁর নাম রাখেন চন্দ্রগর্ত। তাঁদের পরিবার ছিল অত্যন্ত ঐতিহ্যবাহী। বজ্রযোগিনী গ্রামে এখনও তাঁর বসতভিটার চিহ্ন রয়েছে। সেখানকার লোকেরা সেই স্থানটিকে বলেন নাস্তিক পদ্মিত্রের ভিটা। চন্দ্রগর্ত শৈশবকাল থেকেই খুবই মেধাবী ছিলেন। জ্ঞান অর্জনের প্রতি তাঁর প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। খুব অল্প সময়েই তিনি সংস্কৃত ভাষায় পাদ্রিত্য অর্জন করেন। তাহাড়া চিকিৎসাশাস্ত্র এবং কারিগরি বিদ্যায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন। প্রবর্তী সময়ে তিনি জ্ঞান অর্জনের

জন্য চলে গেসেন নালদা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি কঠোর অধ্যবসায়গুণে নানা শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করেন। চন্দ্রগুর্ত উনত্রিশ বছর বয়সে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন তাঁর নতুন নাম হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। একত্রিশ বছর বয়সে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সুর্বণ দীপে যান। তাঁর সঙ্গে ছিল শতাধিক শিষ্য। সেখানে তিনি দীর্ঘ বার বছর বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন।

তারপর দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান দেশে ফিরে আসেন। তখন বাংলাদেশের রাজা ছিলেন নয়াপাল। রাজার অনুরোধে তিনি বিক্রমশীলা মহাবিহারের অধ্যফেরের পদ গ্রহণ করেন। তিনি নালদা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্যও ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময়ে তিক্রতে বৌদ্ধধর্মে নানারকম অনাচার প্রবেশ করে। তিক্রতের রাজা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা শুনে তাঁকে তিক্রতে আমন্ত্রণ জানান। রাজার ধারণা ছিল, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে নিয়ে যেতে পারলে সে দেশের মানুষের প্রকৃত ধর্মীয় চেতনার বিকাশ ঘটবে। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান রাজার আমন্ত্রণে প্রথম সাড়া দেননি। কিন্তু পরে তিনি রাজি হন। আনুমানিক ১০৮১ সালে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিক্রতের উদ্দেশে রওয়ানা হন।



অতীশ দীপঙ্করের তিক্রত যাত্রা

সে সময় তিক্রতে যাওয়ার পথ সুগম ছিল না। অনেক কফ্টে হিমালয়ের দুর্গম পথ অতিক্রম করে তিনি তিক্রতে প্রবেশ করেন। তিক্রত সীমান্তে অপেক্ষারত রাজপ্রতিনিধিরা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে বিপুল সংবর্ধনা জানান। তিনি তিক্রতের প্রধান প্রধান শহর, নানা গ্রাম ঘুরে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। তাঁর পাণ্ডিত্য ও ব্যবহারে লোকে মুগ্ধ হতো। তিক্রতের লোকেরা তাঁর ধর্মদেশনা শুনে আন্তে আন্তে ফিরে পেল প্রকৃত ধর্মীয় চেতনা। ধর্মে যেসব অনাচার প্রবেশ করেছিল, সেগুলো তারা পরিত্যাগ করল।

বিজ্ঞমশীলা ত্যাগ করার সময় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বলে গিয়েছিলেন তিক্ততে তিনি মাত্র তিন বছর থাকবেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে দেশে আর ফিরে আসা সম্ভব হয়নি। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত তিক্ততেই থেকে গেলেন। তিক্ততের মানুষকে তিনি খুব ভালোবেসে ফেলেছিলেন। তিক্ততিরাও তাঁকে খুব শুন্ধা করতেন এবং ভালোবাসতেন।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিক্ততি ভাষায় বহু ধর্মীয় গ্রন্থ রচনা করেন। তা ছাড়া অনেক বই সংস্কৃত থেকে তিক্ততি ভাষায় অনুবাদ করেন। চিকিৎসা ও কারিগরি বিদ্যা সম্পর্কেও তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

তিক্ততের এথাং বিহারে তাঁকে ‘অতীশ’ উপাধি প্রদান করা হয়। ‘অতীশ’ খুব সম্মানজনক উপাধি। ১০৫৪ সালে তিক্ততের এথাং বিহারে ৭৩ বছর বয়সে এই মহাপণ্ডিত মৃত্যুবরণ করেন। অতীশের দেহভঙ্গ সেই বিহারে অত্যন্ত মর্যাদার সাথে সংজ্ঞানিত আছে। ১৯৭৮ সালে চীন থেকে তাঁর দেহভঙ্গের কিছু অংশ বাংলাদেশে আনা হয়। ঢাকার ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহারে এগুলো সংজ্ঞানিত আছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

অতীশ দীপঙ্করের জন্মভূমি পরিদর্শনের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করো (দলীয় কাজ)।

পাঠ : ৭

মনীষীদের জীবনীর অনুসরণীয় দিক

কোনো মহৎ জীবনই সহজে গড়ে উঠে না। এর জন্য প্রচেষ্টা ও সাধনা করতে হয়। যাঁরা একেপ কীর্তিমান জীবন গঠনে সচেতন, তাঁরা অমরত্ব লাভ করেন। ইতিহাসে তাঁরা অমর হয়ে থাকেন। শুগ-যুগান্তরের মানুষ তাঁদের আদর্শ ও গুণবলি অনুশীলন করেন। মহৎ মানুষের জীবনাদর্শে আমাদের অনুসরণীয় অনেক বিষয় রয়েছে। তাই এই জীবনীসমূহ পাঠ করে শুধু মানসিক আনন্দ লাভ করলেই হবে না, আদর্শিক দিকগুলোও আমাদের অনুশীলন করতে হবে। আবেগে কোনো কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়। একাগ্র অনুশীলন ও অনুসরণের মাধ্যমেই একমাত্র লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়। গৌতম বুদ্ধ নৈতিকতার আদর্শ অনুসরণে জীবনকে সুন্দর করার জন্য অনেক উপদেশ দিয়েছিলেন।

বুদ্ধের সময়ে বক্তৃ নামে একজন মুনি ছিলেন। তিনি বুদ্ধের খুবই শক্ত ছিলেন। তিনি সর্বদা বুদ্ধের জ্যোতির্ময় দেহাবয়বের দিকে ভক্তিচিন্তে একদৃঢ়িতে চেয়ে থাকতেন। ভগবান বুদ্ধ দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ করে একসময় তাঁকে ডেকে বললেন; এই ধর্মশীল দেহাবয়বের দিকে চেয়ে থেকে ফল কী? নীতি-আদর্শ অনুসরণ করো। আবেগ ত্যাগ করো। নিজের মধ্যে জ্যোতির্ময় আঙোক উৎপদনের বীজ বপন করো। নিজেকে আলোকময় করে গড়ে তোলো। বুদ্ধের এই উপদেশ লাভ করে বক্তৃ ঝুঁতি সাধনায় রত হলেন এবং অচিরেই অর্হত ফলে উন্নীত হন।

অনুরূপ আর একটি ঘটনা জানা যায়। তখন বুদ্ধ উরুবিষ্ণু নগরে পরিদ্রমণ করছিলেন। সে সময় উরুবিষ্ণু বনে বাস করতেন তিনজন ঝুঁতি। উরুকেলাকশ্যপ, নদীকশ্যপ ও গয়াকশ্যপ তিনি ভাই। তাঁরা নিজ নিজ শিয় নিয়ে পৃথক পৃথকভাবে সেখানে বাস করতেন। তাঁরা কারো নীতি অনুসরণ করতেন না। নিজেদের ধারণা মতে গরমে ও আগুনে তঙ্গ হয়ে এবং ঠাণ্ডায় পানিতে ডুবে থেকে দুঃখ মুক্তির চেষ্টা করতেন। বুদ্ধের সাথে সাক্ষাৎ হলে বুদ্ধ তাঁদের উপদেশ দেন।

বুদ্ধ বলেন, পানিতে ভিজে বা রোদে পুড়ে মানুষ পরিশুদ্ধ হতে পারে না। বুদ্ধ তাঁদের কাছে নিজের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বর্ণনা করেন। তারপর বলেন, জীবনকে পরিশুদ্ধ করতে হলে আদর্শ ও নৈতিকতার অনুশীলন আবশ্যিক। পরে তাঁরা বুদ্ধের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে ব্রহ্মচর্য পালনের মাধ্যমে মুক্তি অন্বেষণে ব্রতী হন।

সুতরাং মহৎ জীবন গঠনের জন্য মহৎ আদর্শের অনুসরণ আবশ্যিক। আমাদের জীবনকে খ্যাতিসম্পন্ন ও জ্যোতির্ময় করার জন্য আলোকিত ব্যক্তিদের জীবনাদর্শ অনুসরণ করা একাত্ম প্রয়োজন। থের-থেরী ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ মনীষীরা আদর্শের পথিকৃৎ। তাঁদের জীবনচরিত থেকে তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, অধ্যবসায়, সংহাম ও অনুশীলনীয় নীতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারি। তাঁদের জীবনীর এই অনুসরণীয় দিকগুলো সঠিকভাবে অনুশীলন করতে পারলে সকলের জীবন সার্থক ও সফল হবে।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করো

১. উপাসির জন্ম কপিলাবস্তুর নিম্নকূপের বৎশে।
২. বুদ্ধ উপাসিকে বলে ঘোষণা করেন।
৩. রাজগৃহের প্রথম মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়।
৪. কৃশা গৌতমী বুঝতে সমর্থ হলেন জন্মের সাথে একই সূত্রে গাথা।
৫. এই শরীর আর আলয়।
৬. অতীশ দীপজক্ত খ্রিষ্টান্দে জন্মাই হণ করেন।
৭. অতীশ দীপজক্ত বাংলাদেশের প্রামে জন্মাই হণ করেন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১. আনন্দ থের'র দুটি উপদেশ লেখ।
২. কৃশা গৌতমীর উপদেশ কী কী?
৩. অর্হত্বাঙ্গ হয়ে অভিজ্ঞপা নন্দা কী বলেছিলেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. উপাসি থের কীভাবে বিনয়ে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন? বর্ণনা করো।
২. আনন্দ থের এর জীবন চরিত্রে আগোকে তার গুণাবলি ব্যাখ্যা করো।
৩. কৃশা গৌতমী জীবনের বাস্তবতা থেকে কী শিক্ষাই হণ করেছিলেন ব্যাখ্যা করো।
৪. অভিজ্ঞপা নন্দা বুঝতে পারলেন রূপ ক্ষণস্থায়ী, অন্তরের সৌন্দর্যই চিরস্থায়ী ব্যাখ্যা করো।
৫. পদ্ধতি অতীশ দীপজক্তের জীবন ও কর্ম ব্যাখ্যা করো।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. চন্দ্রগর্ত কত বছর বয়সে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন?

- | | |
|-------|-------|
| ক. ১৬ | খ. ১৯ |
| গ. ২৭ | ঘ. ২৯ |

২. উপালি খের'র জীবনী থেকে শিক্ষা পাওয়া যায়-

- i. সৎকর্ম করার প্রচেষ্টার
- ii. সূত্র আবৃত্তির প্রচেষ্টার
- iii. নির্ণোভ হওয়ার

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. i ও iii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

সুভদ্রা তথ্বজ্ঞা কল্পে, চেহারায় ও চরিত্রে অনন্য। যথাসময়ে তাঁর পছন্দ করা এক কল্পবান যুবকের সাথে বিয়ে হয়। কিন্তু তাঁর সংসারজীবন ক্ষণস্থায়ী হয়। পরবর্তী সময়ে চিন্ত পরিবর্তন করে তিনি বিহারযুথী হন এবং ব্রহ্মচর্য পালনে সচেষ্ট হন।

৩. সুভদ্রা তথ্বজ্ঞার সাথে পাঠ্যবইয়ের কার চরিত্রের মিল খুঁজে পাওয়া যায়?

- | | |
|----------------------|----------------|
| ক. মহাপ্রজাপতি গৌতমী | খ. কৃশ্ণ গৌতমী |
| গ. অভিজ্ঞপা নন্দা | ঘ. মন্ত্রিকা |

৪. ব্রহ্মচর্য পালনের মাধ্যমে সুভদ্রা তথ্বজ্ঞা করতে পারেন-

- i. নতুন জীবন শুরু
- ii. ত্বরণার ক্ষয়
- iii. মনকে শান্ত ও সংযত

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|-----------|-------------|
| ক. i | খ. ii |
| গ. i ও ii | ঘ. ii ও iii |

সূজনশীল প্রশ্ন

১. পটচারা ধনী পরিবারের মেয়ে, কিন্তু বিয়ে করেন এক গরিবের ছেলেকে। একদিন তার বাবার বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছা হলো। তাই স্বামী-সন্তানদের নিয়ে বাবার বাড়িতে যাওয়ার পথে স্বামীকে সাপে কাটল। তখন তিনি একা দুই সন্তানকে নিয়ে রাগুয়ানা হলেন। মাঝপথে ছোট নদী থাকায় প্রথমে তিনি ছোট শিশুটি নিয়ে নদী পার হলেন। বড় শিশুকে নেওয়ার জন্য তিনি অপর পারে আসছিলেন। কিন্তু তিনি যখন নদীর মাঝখানে, তখন বড় শিশুটি দেখল ছোট শিশুটিকে ইগল পাখি নিয়ে চলে যাচ্ছে। ইগল পাখিকে তাড়াতে চিঢ়কার করতে করতে বড় ছেলে নদীতে ঝাপ দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে নদীর পানিতে তলিয়ে গেল। স্বামী-সন্তান হারিয়ে একসময় বুদ্ধের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বুদ্ধের আশীর্বাদে তিনি স্বত্ত্ব ফিরে পেলেন। পরবর্তীতে তিনি ভিক্ষুণী পথ অবলম্বন করেন।

ক. উপালি কোন বৎশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

খ. তিক্রতের রাজা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে তিক্রতে আমন্ত্রণ জানালেন কেন?

গ. উদ্বীপকে বর্ণিত পটচারার ঘটনায় চরিতমালার কার জীবনের ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. ‘পটচারার অনুসৃত পথে কি নির্বাণ লাভ সম্ভব?’ — পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

২. ক্ষেমা তাঁর রূপ নিয়ে অহংকারী ছিলেন। তাঁর রাপের অহংকার বৃদ্ধি কর্তৃক নিষিদ্ধ হবে মনে করে ক্ষেমা বুদ্ধের সম্মুখে যেতেন না। একদিন ক্ষেমা বুদ্ধের কাছে যেতে সম্ভত হলে বৃদ্ধি একটি অলৌকিক দৃশ্য সৃষ্টি করেন। দৃশ্যটি হলো, স্বর্গের এক অপ্সরা তালপাতার পাথা নিয়ে বুদ্ধকে বাতাস করছে। তখন ক্ষেমা অবাক বিশয়ে স্বর্গের অপ্সরাকে দেখতে শাগলেন। বুদ্ধের ইচ্ছা অনুযায়ী অপ্সরা একসময় ঘোবন থেকে মধ্য বয়সে রূপান্তরিত হয়ে গেল। তাঁকে বার্ধক্য গ্রাস করল। অপ্সরার দাত নেই, চামড়া কুঁচকানো, চুল পাকা। একসময় বৃদ্ধা অপ্সরা মাটিতে পড়ে গেল। তখন ক্ষেমা অনুভূত হয়ে বললেন, হায়! অপরূপ সৌন্দর্যের এই পরিণতি! আমার দেহেরও একদিন এ পরিণতি হবে।

ক. বুদ্ধের সেবক কে ছিলেন?

খ. পূর্ণকে আগে প্রবৃজ্ঞা দেওয়া হলো কেন?

গ. উদ্বীপকে বর্ণিত কাহিনিটি চরিতমালার কোন চরিত্রের সঙ্গে মিল রয়েছে, ব্যাখ্যা করো।

ঘ. ‘আমার দেহেরও এ পরিণতি হবে’ — চরিতমালার আলোকে উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করো।

জাতক

গৌতম বুদ্ধের অতীত জন্মের কাহিনিগুলো জাতক নামে পরিচিত। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে জাতকের গৱ্ন ও উপদেশগুলোর প্রভাব অপরিসীম। জাতকের গৱ্নের শেষে যে উপদেশ থাকে, তা থেকে আমরা নৈতিক ও মানবিক গুণাবলি অর্জন করতে পারি। এছাড়া জাতক পাঠে প্রাচীন ভারতের মানুষের জীবনযাত্রা, ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ভূগোল, পরিবেশ, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি সম্পর্কেও জানা যায়। তাই জাতক পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম। এ অধ্যায়ে আমরা জাতক সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- * জাতক সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারব;
- * জাতক কাহিনী বর্ণনা করতে পারব;
- * জাতকের উপদেশ ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

জাতক পরিচিতি ও জাতকের সংখ্যা

জাতক শব্দটি ‘জাত’ শব্দ হতে উদ্ভৃত হয়েছে। ‘জাত’ শব্দের অর্থ হলো উৎপন্ন, উদ্ভৃত, জন্ম ইত্যাদি। সুতরাং জাতক শব্দের অর্থ যিনি উৎপন্ন বা জন্ম লাভ করেছেন। বুদ্ধ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনা উপলক্ষে শিষ্যদের তাঁর অতীত জন্মের কাহিনি বর্ণনা করতেন। গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্মের ঐ কাহিনিগুলোকে জাতক বলা হয়। এক জন্মের কর্মফলে কেউ বুদ্ধ হতে পারেন না। বুদ্ধ হওয়ার জন্য জন্ম-জন্মান্তরে পারমী পূর্ণ করে পরিশুমিতা অর্জন করতে হয়। জাতক পাঠে জানা যায়, জন্ম-জন্মান্তরে গৌতম বুদ্ধ নানা কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মানবকুলে রাজা, মন্ত্রি, ব্রাহ্মণ, বণিক, এবং দেবকুলসহ বিভিন্ন পশু-পাখি হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন। প্রতিটি জন্মে তিনি ‘বোধিসত্ত্ব’ নামে অভিহিত হন। বোধিসত্ত্ব প্রতিটি জন্মে কৃশলকর্ম সম্পাদন করতেন। এক কথায় বলা যায়, গৌতম বুদ্ধের বোধিসত্ত্বরূপে অতীত জন্মবৃত্তান্ত ও ঘটনাবলিসমূহ ‘জাতক কাহিনী’ নামে খ্যাত।

মূলত জাতকের সংখ্যা ৫৫০টি। গৌতম বুদ্ধ ৫৫০তম জন্মে বোধিজ্ঞান লাভ করে ‘বুদ্ধ’ নামে অভিহিত হন। শ্রী দীশ্বানচন্দ্ৰ ঘোষ সম্পাদিত জাতক গ্রন্থে মোট ৪৪৭টি জাতক কাহিনির উল্লেখ পাওয়া যায়। কথিত আছে, ৩টি জাতক কাহিনি কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে।

অনুশীলনমূলক কাজ
‘জাতক’ শব্দের অর্থ কী?

পাঠ : ২

নৈতিক ও আদর্শ জীবন গঠনে জাতকের প্রভাব

সৎ এবং সুন্দর পথে পরিচালিত জীবনই হলো আদর্শ জীবন। আদর্শবান ব্যক্তি সকলের কাছে শুধুমাত্র পাত্র। মৃত্যুর পরও নীতিবান এবং আদর্শবান ব্যক্তির কথা মানুষ যুগে যুগে স্মরণ করে থাকে। তাই আমাদের সকলের উচিত অনৈতিক কাজকর্ম থেকে বিরত থাকা। কেননা নীতি-আদর্শহীন ব্যক্তি পশুর সমান। আদর্শ ও নৈতিক জীবন কীভাবে গঠন করতে হয়, তা জাতক পাঠে জানা যায়।

জাতকের গল্পগুলো হিতোপদেশমূলক। এগুলো কৃপকথার গল্প নয়। ডগবান বুদ্ধ ভালো কাজের সুফল এবং খারাপ কাজের কুফল বোঝানোর জন্য জাতক কাহিনিগুলো বলতেন। তাই সুন্দর মানবজীবন গঠনে জাতকের গুরুত্ব অপরিসীম। জাতক কাহিনিগুলো ধর্মের গভীর তত্ত্বগুলো বুবাতে সাহায্য করে। ভালো কাজে উৎসাহ জোগায়। উদার চিন্তে দান দিতে শিক্ষা দেয়। শীলবান বা চরিত্রবান, দয়াবান, নীতিবান, সত্যবাদী, ক্ষমাপরায়ণ, মেত্রীপরায়ণ এবং পরোপকারী হতে শিক্ষা দেয়। প্রাণী হত্যা, মিথ্যা বলা, চুরি, ব্যভিচার, মাদকদ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখে। কায়, বাক্য এবং মন সংযত করে। সম্যক জীবিকা অবলম্বন করতে উৎসাহ জোগায়। সমাজ থেকে জাতিভেদ প্রথা দূর করতে সহায়তা করে। ভ্রাতৃবোধ জাগ্রত করে। পরমতসহিষ্ণু এবং পরধর্মের প্রতি শুদ্ধাশীল হতে শিক্ষা দেয়। সকল জীবের প্রতি মেত্রীভাবাপন্ন করে তোলে। বলা যায়, নৈতিক এবং আদর্শ জীবন গঠনে জাতকের প্রভাব অপরিসীম। তাই প্রত্যেকের জাতকের শিক্ষা অনুসরণ করা উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

জাতকের কাহিনি থেকে আমরা কী শিক্ষা লাভ করতে পারি, তার একটি তালিকা তৈরি করলো।

পাঠ : ৩

কপোত জাতক

পুরাকালে বারাণসিরাজ ব্রহ্মদণ্ডের রাজত্বকালে বৌদ্ধিসন্তু পায়রাকৃপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন বারাণসির লোকেরা পুণ্য কামনায় পাখিদের সেবা করত। পাখিদের জন্য ঘরের বাইরে ও ভিতরে নানা জায়গায় বুড়ি বুলিয়ে রাখত। পায়রাকৃপী বৌদ্ধিসন্তু সে রকম একটি বুড়িতে রাতে থাকতেন। সেখান থেকে প্রতিদিন সকালে খাবার খুঁজতে বেরিয়ে পড়তেন। খাবার থেয়ে সম্ম্যার সময় সেই বুড়িতে এসে শয়ন করতেন।

একদিন এক কাক সেই ঘরের পাশ দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় রান্নার চমৎকার গন্ধ পেল। সে উকি দিয়ে দেখল ভিতরে মাছ-মাংস রান্না হচ্ছে। লোভী কাক বাইরে বসে ভাবতে লাগল, কেমন করে ঐ মাছ-মাংস খাওয়া যায়। সম্ম্যার সময় পায়রাকৃপী রান্নাঘরে চুকতে দেখে ভাবল, পায়রাটার সঙ্গে ভাব করেই উদ্দেশ্য সফল করতে হবে।

পরদিন ভোরে বৌদ্ধিসন্তু ঘৃম থেকে উঠে খাবার খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন। কাকও তাঁর পেছন পেছন ছুটল। বৌদ্ধিসন্তু বললেন, ‘তুমি আমার সঙ্গে চললে কেন?’ কাক বলল, ‘আপনার চালচলন আমার খুব ভালো লাগছে। আমি এখন থেকে আপনার অনুচর হয়ে থাকব।’



পাচক ও লোভী কাক

তারপর থেকে কাকটি বৌধিসত্ত্বের সঙ্গে থাকতে লাগল। পাচক দেখল, পায়রার সঙ্গে একটি কাক এসে থাকছে। তাই সে কাকের জন্যও একটি ঝুড়ি ঝুলিয়ে দিল। সেই থেকে কাকটি ও সেই বাড়িতে থাকতে লাগল। একদিন শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে প্রচুর মাছ-মাংস রাখা হচ্ছিল। তা দেখে কাকের খুব লোভ হলো। সে ঠিক করল পরদিন সে খাবার খুঁজতে বাইরে যাবে না। এই ভেবে সে সারা রাত অসুস্থতার ভান করে পড়ে রইল। সকালে সে ঠিক করল, পায়রার সঙ্গে খাবার খেতে বাইরে যাবে না। বৌধিসত্ত্বের মনে সন্দেহ হলো। তাই তিনি কাককে বললেন, ‘বেশ, তুমি থাকো। তবে সাবধান লোভে পড়ে কোনো কিছু করে বসো না।’ কাককে উপদেশ দিয়ে বৌধিসত্ত্ব নিজের খাবার খুঁজতে চলে গেলেন।

এদিকে পাচক রাখা শুরু করল। রাখার হাঁড়ি থেকে বাষ্প বেরোনোর জন্য হাঁড়ির মুখ একটু খোলা রাখল। একটা হাঁড়ির মুখ বাঁকারি দিয়ে ঢেকে দিল। রাখার সুগন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। এ সময় পাচক গায়ের ঘাম শুকানোর জন্য রাখাঘরের বাইরে বারান্দায় গেল। কাক ঠিক সে সময় ঝুড়ি থেকে বেরিয়ে হাঁড়ির ওপর বাঁকারিতে গিয়ে বসল। তখনই বাঁকারিটা মাটিতে পড়ে ঝন্ঝন্ঝন্ঝ শব্দ হলো। পাচক সেই শব্দ শুনে রাখাঘরে ছুটে এল।

এসে দেখল, কাক মাংস খাওয়ার চেষ্টা করছে। পাচক সঙ্গে সঙ্গে ধূর্ত কাকের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল। সে তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে কাকটিকে ধরে ফেলল। এরপর সারা শরীরের পালক তুলে নিয়ে গায়ে আদা ও নুন মেথে দিল। তারপর তাকে বুড়ির মধ্যে ফেলে রাখল। বস্ত্রণায় কাক হটফট করতে লাগল।

বোধিসত্ত্ব সম্বয় ফিরে এসে কাককে দেখে সব বুঝতে পারলেন। তখন তিনি ভাবলেন, লোভী কাক আমার কথা না শোনায় এই ফল পেয়েছে। তারপর তিনি একটি গাথা বললেন। গাথাটির অর্থ হলো :

‘উপকারী বন্ধুর কথা হেচাচারীরা শোনে না। এ জন্য তার ওপর বিপদ নেমে আসে। কাক তার প্রমাণ।’

বোধিসত্ত্ব এই গাথা আবৃত্তি করে নিজে বললেন, আমি আর এখানে থাকতে পারি না। তারপর তিনি সেখান থেকে অন্য জায়গায় চলে গেলেন।

কাক সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল। পাচক বুড়িসহ কাকটি ফেলে দিল।

উপদেশ : লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাক কেন পায়রার সাথে বন্ধুত্ব করল?

ধূর্ত কাকের পরিণতি বর্ণনা করো।

পাঠ : ৪

শশক জাতক

অতীতকালে বারাগসি রাজ্যের রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। তাঁর রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব শশককুলে জন্মগ্রহণ করে এক বনে বাস করতেন। ঐ বনের একদিকে পর্বত, একদিকে নদী এবং একদিকে গ্রাম। শশককুলী বোধিসত্ত্বের তিন বন্ধু ছিল। শিয়াল, বানর ও উদ্বিড়াল। চার বন্ধু বাস করত গজা নদীর তীরে। শশক ছিলেন খুব পণ্ডিত। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি বন্ধুকে ‘দান করা উচিত’, ‘শীল রক্ষা করা উচিত’, ‘উপোসথ পালন করা উচিত’ - এরূপ ধর্মোপদেশ দিতেন। বন্ধুরা উপদেশসমূহ গ্রহণ করত। এভাবে অনেক দিন কেটে গেল।

একদিন শশক টাদ দেখে বুঝলেন, পরদিন পূর্ণিমা। বন্ধুদের বললেন, ‘আগামীকাল পূর্ণিমা। তোমরা শীল গ্রহণ করে উপোসথ পালন করো। শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দান করো। শীলবান ব্যক্তির দান মহাফলদায়ক। কোনো যাচক উপস্থিত হলে তোমরা নিজের খাবারের অংশ হতে তাকে খাবার দেবে।’

উপদেশ শুনে বন্ধুরা খাবারের খোজে বের হলো।

শিয়াল এক বাড়িতে ঢুকল। সে দেখল এক হাঁড়ি মাংস, মিষ্টি ও এক ভার দই বারান্দায় পড়ে আছে। সে উচ্চ স্বরে তিনবার হাঁক দিল – এগুলো কার? এগুলো কার? এগুলো কার? কেউ সাড়া দিল না। তখন সে ঐ সব দ্রুব্য নিয়ে গতে ফিরে এল এবং ‘বেলা হলে আহার করব’ এরূপ সংকল্প করে শীলভাবনা করতে থাকল।

ওদিকে উদ্বিড়াল সমুদ্রের তীরে গিয়ে মাছের গন্ধ পেল। বালি খুঁড়ে সে চারটি মাছ বের করল। সে-ও তিনবার বলল- এগুলো কার? এগুলো কার? এগুলো কার? কেউ সাড়া দিল না। তখন সে মাছগুলো গর্তে নিয়ে এল এবং ‘বেলা হলে আহার করব’-এরূপ সংকল্প করে শীলভাবনা করতে থাকল।

বানরও বন থেকে একগুচ্ছ আয় পেড়ে নিয়ে এল এবং ‘বেলা হলে আহার করব’-এরূপ সংকল্প করে শীলভাবনা করতে থাকল।



শশকরণী বোধিসত্ত্ব বন্ধুদের উপদেশ দিচ্ছেন

এদিকে বোধিসত্ত্ব ত্রৃণ ভক্ষণ করবেন বলে স্থির করলেন এবং চিন্তা করতে লাগলেন, ‘আমার খাবার তো ঘাস। মানুষ ঘাস খায় না। আমার কাছে কোনো যাচক উপস্থিত হলে তাকে কী দিয়ে আপ্যায়ন করব’।

তারপর সিদ্ধান্ত নিলেন, নিজের শরীরের মাংস আগুনে পুড়িয়ে তা দিয়ে আপ্যায়ন করবেন।

দেবরাজ ইন্দ্র শশকের মহাসংকল্পের কথা জানতে পারলেন। দান পরীক্ষার জন্য ইন্দ্র এক ব্রাহ্মণের বেশে সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি একে একে সবার দান গ্রহণ করলেন। অবশ্যে শশকের কাছে এলেন। শশক তাকে দেখে খুব খুশি। ব্রাহ্মণরূপী ইন্দ্রকে বললেন, ‘আপনি আহারের জন্য আমার কাছে এসে উত্তম কাজ করেছেন। আমি আপনাকে এমন দান দেব, যা আগে কেউ কখনো দান করেনি। আপনি আগুন জ্বালুন। আমি তাতে ঝাপ দেব। আগুনে আমার শরীর সিদ্ধ হলে আপনি সেই মাংস খেয়ে শ্রামণ্য ধর্ম পালন

করবেন।' ইন্দ্র খড়কুটো দিয়ে আগুন জ্বালালেন। শশকরূপী বোধিসত্ত্ব তিনবার গা ঝাড়া দিলেন। পোকা-মাকড় থাকলে যাতে শরীর থেকে পড়ে যায়। তারপর নির্ভরে আগুনে বাঁপ দিলেন। কিন্তু আশ্চর্য আগুন তাঁর একটি কেশও স্পর্শ করল না। শশক ব্রাহ্মণকে বললেন, ব্রাহ্মণ! তোমার আগুন এত শীতল কেন?

ইন্দ্র নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, হে শশক! আমি ইন্দ্র। তোমার দান পরীক্ষার জন্য একপ করেছি।

শশক বললেন, হে দেবরাজ! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবাই আমার দান পরীক্ষা করুক। আমাকে কখনো দানবিমুখ দেখবে না।

ইন্দ্র বললেন, 'শশক, তোমার খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক।' দেবরাজ ইন্দ্র চন্দ্রমহলে একটি শশকচিহ্ন ঢাঁকে দিলেন। সে কারণে আজও আমরা চাঁদে একটি শশকের চিহ্ন দেখি।

উপদেশ : শীলবান ব্যক্তিরা সর্বত্র পূজিত হয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

শশকের বশ্য কারা?

পাঠ : ৫

আন্তর্জাতিক

পুরাকালে বারাণসি রাজ্যে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। তার রাজত্বকালে উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে বোধিসত্ত্ব জন্মাই হল। বয়োঃপ্রাপ্তির পর বোধিসত্ত্ব খবি প্রবেশ করেন। তিনি পাঁচশত বিন্দু সঙ্গে নিয়ে হিমালয়ের পাদদেশে বাস করতেন।

একবার হিমালয়ে ভয়ানক অনাবৃষ্টি দেখা দিল। সব জলাশয় শুকিয়ে গেল। চারদিকে পানীয় জলের বড় অভাব। তৃষ্ণায় পশুপাখি সব কাতর হয়ে পড়ল। কোথাও এক ফেঁটা জল নেই। পশুপাখিদের এই যন্ত্রণা দেখে এক ভিন্নুর মায়া হলো।

ভিন্নু একটা গাছ কাটলেন। সেই গাছের ডাল দিয়ে একটা ডোঙা তৈরি করলেন। ডোঙাটি জলপূর্ণ করে তিনি পশুপাখিদের জলপানের ব্যবস্থা করে দিলেন। বনের সব পশুপাখি এসে সেই ডোঙা থেকে জলপান করতে লাগল। এতে অসংখ্য জীবের থাণ রক্ষা গ্রেল।

প্রতিদিন অসংখ্য থাণী জলপান করতে আসতে লাগল। ফলে ভিন্নু আহারের জন্য ফলমূল সংগ্রহ করার সময় পেতেন না। ভিন্নু তার নিজের আহারের কথা ভুলে গিয়ে দিনরাত থাণীদের তৃষ্ণা মেটাতে লাগলেন। এটা দেখে পশুপাখিরা চিন্তিত হয়ে পড়ল। তাদের তৃষ্ণা মেটানোর কাজে ব্যক্ত থাকার কারণে ভিন্নু অনাহারে থেকে কষ্ট ভোগ করছেন। তারা ঠিক করল, এবার থেকে যে থাণী যখন জলপান করতে আসবে, তখন তার সাধ্য অনুসারে ভিন্নুর জন্য কিছু ফল নিয়ে আসবে।



প্রাণীরা জলপান করছে

এরপর থেকে প্রতিটি পশুপাখি নিজের সাধ্যমতো আম, জাম, কঠাল, মধুর, অমধুর প্রভৃতি ফল নিয়ে জলপান করতে আসতে লাগল। এভাবে প্রতিদিন এত ফল আসতে লাগল যে, অশ্বমের পাঁচশ ভিক্ষুও খেয়ে শেষ করতে পারতেন না।

সৎ কাজে ভিক্ষুটির এই আতোৎসর্গ দেখে বোধিসত্ত্ব বললেন, ‘দেখো, সৎ কাজের কী অঙ্গুত মহিমা! একজনের ব্রতের ফল কতজন ভিক্ষু ভোগ করছে। তাদের কাউকে আর ফল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কষ্ট করে বলে যেতে হচ্ছে না।’

উপদেশ : কুশলকর্ম সম্পাদনে সকলেরই উদ্যমশীল হওয়া উচিত।

অনুশীলনমূলক কাজ

ভিক্ষু কেন প্রাণীদের জন্য জলপানের ব্যবস্থা করেছিলেন?

পাঠ : ৬

মশক জাতক

পুরাকালে বারণসিরাজ ব্রহ্মাদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব বাণিজ্য করে জীবন ধারণ করতেন। তখন কাশী রাজ্যের এক ধামে অনেক সুত্রধর বাস করত। তারা কাঠ দিয়ে নানারকম আসবাব তৈরি করত। সেখানে একদিন এক বৃক্ষ সূত্রধর কাঠ কেটে আসবাবপত্র তৈরির কাজ করছিল। পাশে তার পুত্র বসে ছিল। এমন সময় এক মশক তার মাথায় বসে সুঁচালো হুল ফুটিয়ে দিল। সে পুত্রকে ডেকে বলল, ‘বৎস, আমার মাথায়

মশক হুল ফুটিয়ে রক্ত পান করছে। তুমি মশকটি তাড়িয়ে দাও।' পুত্র বলল, 'বাবা, আপনি স্থির থাকুন। আমি এক আঘাতেই মশকটি মেরে ফেলব।' ঐ সময় বৌধিসন্তু পণ্যসম্ভার নিয়ে বৃন্দ সূত্রধরের বাড়ির সামনে এসে হাজির হলেন। তিনি বাড়ির সামনে বসলেন। তিনি বসলে সূত্রধর আবার বলল, 'বৎস, মশকটি তাড়িয়ে দাও।' তখন তার ছেলে 'তাড়াচি' বলে এক প্রকাও তীক্ষ্ণধার কুঠার উভোলন করল এবং পিতার পেছন দিক থেকে 'মশা মারি', 'মশা মারি' বলতে বলতে বৃন্দের মাথায় জোরে আঘাত করল। সাথে সাথে বৃন্দের



বৃন্দ ও মূর্খ ছেলের কাণ্ড

মাথা ফেটে রক্ত বের হতে লাগল এবং বৃন্দ মৃত্যুযুথে পতিত হলো। বৌধিসন্তু এই কাণ্ড দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, এত নির্বোধ লোক কোথাও দেখিনি। একপ মূর্খের চেয়ে পণ্ডিত শত্রুও অনেক ভালো। কারণ যিনি বুদ্ধিমান তিনি শাস্তির ভয়ে মানুষ হত্যা থেকে বিরত থাকেন। কিন্তু ছেলেটি এতই মূর্খ যে মশা মারতে গিয়ে নিজের বাবাকে মেরে ফেলল।

মূর্খ ছেলের এই কাজ দেখে বৌধিসন্তু একটি গাথা আবৃত্তি করে সে স্থান ত্যাগ করলেন। গাথাটি হলো :

বুদ্ধিমান শত্রু সেও মোর ভালো

নির্বোধ মিত্রে কী কাজ?

মশক মারিতে বধিল পিতারে

মহামূর্খ পুত্র আজ।

উপদেশ : মূর্খ বন্ধুর চেয়ে বৃদ্ধিমান শত্রু ভালো।

অনুশীলনমূলক কাজ
সুস্থিত কী কাজ করছিল?

পাঠ : ৭

জাতকের উপদেশসমূহ অনুসরণের সুফল

‘জাতক’ হলো গৌতম বুদ্ধের অভীত জন্মবৃন্তান্ত। বিষ্ণু জাতকগুলোতে অনুসরণীয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ পাওয়া যায়। এসব উপদেশ মানবিক ও নৈতিক গুণাবলির উৎকর্ষসাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই এসব উপদেশ অনুসরণ করা একান্ত উচিত। নিচে জাতকের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও অনুসরণীয় উপদেশ তুলে ধরা হলো। যেমন : কঠোত জাতক পাঠে আমরা লোভের পরিণতি সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতে পারি। এ শিক্ষামতে, অতিরিক্ত লোভ মানুষকে মৃত্যুর দিকে ধাবিত করে। তাই সকলের লোভ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। এভাবে শশক জাতকে শীল পালনের উপকারিতা সম্পর্কে শিক্ষা লাভ করতে পারি। এ জাতকের উপদেশ মতে, শীলবান ব্যক্তি সর্বত্র পুঁজিত হন। আম্রজাতক কৃশলকর্ম সম্পাদনে উদ্যমশীল হওয়ার শিক্ষা দেয়। মশক ও রোহিণী জাতকে মূর্খ বন্ধুর চেয়ে বৃদ্ধিমান শত্রু ভালো বলে নির্দেশনা রয়েছে।

জাতকগুলোতে একপ অনেক উপদেশ পাওয়া যায়, যা নির্বুদ্ধিতা, কৃপণতা, অলসতা, অহংকার, ধূর্ততা ইত্যাদি বর্জনের নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়া এসব উপদেশ আমাদের অকৃশগুর্ব পরিত্যাগ করে কৃশগুর্ব সম্পাদনের প্রেরণা যোগায়। নৈতিক জীবনযাপনে উদুদ্ধ করে। হিংসা ত্যাগ করে মৈত্রীপরায়ণ হতে শিক্ষা দেয়। তাই শাস্তিময় বিশ্ব গড়ে তুলতে জাতকের উপদেশ অনুসরণ অপরিহার্য।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ কর

১. এক জন্মের কেউ বুদ্ধ হতে পারে না।
২. যন্ত্রণায় কাক করতে লাগল।
৩. একদিন শশক দেখে বুবাল পরদিন পূর্ণিমা।
৪. একবার হিমালয়ে ভয়ানক দেখা দিল।

মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. বোধিসত্ত্ব প্রতিটি জন্মে	মাছের গন্ধ পেল।
২. জাতকের কাহিনি গুলো	ধূর্ত কাকের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল।
৩. বারানসির লোকেরা পুণ্য কামনায়	কৃশগুর্ব সম্পাদন করতেন।
৪. পাচক সঙ্গে সঙ্গে	ধর্মের গভীর তত্ত্বগুলো বুঝতে সাহায্য করে।
৫. উদ্বিড়াল সমুদ্রের তীরে গিয়ে	পাখিদের সেবা করতেন।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জাতকের সংখ্যা কত?
২. ভিক্ষু কীভাবে প্রাণীদের জন্য জলপানের ব্যবস্থা করলেন তা সংক্ষেপে বর্ণনা করো।
৩. শশক তাঁর বন্ধুদের কী ধর্মোপদেশ দিতেন?
৪. মশকটি বৃন্দের মাথায় কী করছিল?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. 'জাতক' কাকে বলে? জাতকের পরিচিতি বিস্তারিত বর্ণনা করো।
২. আম্ব জাতকের উপদেশ বর্ণনা কর।
৩. মূর্খ বন্ধুর চেয়ে বৃদ্ধিমান শত্রু কেন ভালো? ব্যাখ্যা করো।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পায়রাঙ্গপী বোবিসদ্বের অনুচর হিসেবে কে থাকত?

ক. মশক খ. কাক

গ. বানর ঘ. শশক

২. উপকারী বন্ধুর কথা স্বেচ্ছাচারীরা না শুনলে-

- i. বিগদ অবশ্যান্তারী হয়
- ii. মৃত্যু অনিবার্য হয়
- iii. সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি গড়ো এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

তরুণ চাকমা পেশায় রাজমিত্রি। কিন্তু যথেষ্ট চতুর। তার ছেলে বিমল চাকমা একেবারে অকর্মণ্য ও বোকা। এ কারণে মাঝে মধ্যে মারাত্মক সমস্যা হয়।

৩. তরুণ চাকমার চরিত্রের সাথে কোন জাতকের মিল রয়েছে?

ক. কপোত জাতক খ. আম্ব জাতক

গ. মশক জাতক ঘ. শশক জাতক

৪. বিমলের আচরণে কোন দিকটি প্রকাশ পায়?

ক. নির্বোধের

খ. সরলতার

গ. অজ্ঞতার

ঘ. হেঁয়ালিপনার

সূজনশীল প্রশ্ন

১. একদা মহেশখালীর নিচ জায়গায় অভিবৃক্তির কারণে নলকুপগুলো ভুবে যায়। এতে বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাব দেখা দেয়। উক্ত এলাকায় দূরবস্থার খবর পত্রিকায় দেখে মানিক বড়ুয়ার মাঝা হয়। তাই তিনি তাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন এবং বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। এতে এলাকাবাসী উপকৃত হয়।

ক. চার বন্ধু কোথায় বাস করত?

খ. অনৈতিক কাজ করা উচিত নয় কেন?

গ. মানিক বড়ুয়ার সাথে জাতকের কার চরিত্রের মিল পাওয়া যায় ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘কুশলকর্ম সম্পাদনে সকলেরই উদ্যমশীল হওয়া উচিত’ – এ উপদেশটির সঙ্গে মানিক বড়ুয়ার কাজটি কতটুকু সাদৃশ্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা কর।

২. এক বুড়িমার নাতির পুতুল কেনার শখ হলো। তাই সে ঠাকুরমার কাছে বায়না ধরে। কিন্তু বুড়িমা সম্মতহীন হওয়ায় নাতির ইচ্ছা পূরণে বাসার পুরনো এক থালা বদল করে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে পুতুল কিনতে চায়। ফেরিওয়ালা থালাটি সোনার বুকাতে পেরে ছলনা করে থালার মূল্য অনেক কম বলে পুতুল দিতে রাজি হয়নি। কিন্তু বুড়ি অন্য এক ফেরিওয়ালার নিকট বেশি দামে থালাটি বিক্রয় করে পুতুল কিনে। পরে প্রথম ফেরিওয়ালা এসে তা শুনে হায় হায় করতে করতে মৃত্যুবরণ করল।

ক. জাতক শব্দের অর্থ কী?

খ. জাতক পাঠের পুরুত্ব বর্ণনা করো।

গ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত গল্পটি কোন জাতকের সাথে সাদৃশ্য? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. লোভী ফেরিওয়ালার আচরণের ফলাফল তোমার পাঠ্যবইয়ের জাতকের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

দশম অধ্যায়

বাংলাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান

বাংলাদেশের বৌদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাচীন ইতিহাস এবং ঐতিহ্য অত্যন্ত গৌরবের। কালের পরিকল্পনায় এগুলো ধ্বনসম্ভূপে পরিণত হয়েছে। খননকার্যের ফলে এসব ধ্বনসম্ভূপ থেকে প্রাচীন অনেক মূল্যবান নির্দর্শন ও প্রত্নসামগ্ৰী আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলোর সঙ্গে বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং বৌদ্ধ রাজন্যবৰ্গের অনেক কীর্তি জড়িত আছে। বাংলাদেশ সরকার এসব ধ্বনসম্ভূপ ও আবিষ্কৃত দ্রব্যাদি ব্যতুসহকারে সংরক্ষণ করছে। এছাড়া বাংলাদেশে বৰ্তমানে অনেক অপূৰ্ব সুন্দর বৌদ্ধবিহার, বৃক্ষমূর্তি ও চৈত্য আছে। দেশ-বিদেশ থেকে অনেক লোক এগুলো দেখতে আসে। তাই এগুলো বাংলাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান হিসেবে খ্যাত। এগুলোর সাথে জড়িয়ে আছে বাংলাদেশের সভ্যতার ইতিহাস। এসব স্থান বৌদ্ধদের নিকট খুবই পৰিত্র এবং প্রিয়। এগুলো দর্শন করলে মনের প্রসারতা বৃদ্ধি পায়। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান সম্পর্কে পড়ব।

এ অধ্যায় শেষে আমরা—

* বাংলাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থানের বর্ণনা দিতে পারব;

* বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থানের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

বাংলাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান পরিচিতি

বাংলাদেশে অসংখ্য বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান আছে। এগুলোর মধ্যে বিহার, চৈত্য, বৃক্ষ, বৌদ্ধিসম্ভূত ও দেৰ-দেৰীৰ মূর্তি, স্তূপ, প্রাচীন বৌদ্ধবিহার ও নগরের ধ্বনসাবশেষ, ব্যবহার্য দ্রব্য, পোড়ামাটিৰ ফলক, চিত্ৰ, মূদ্রা, শিলালিপি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসবের প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অপরিসীম। দেশ ও জাতিৰ উন্নতিৰ জন্য ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়াৱ প্ৰয়োজন আছে।

খননকার্যের ফলে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অনেক প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বনসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। কুমিল্লার ময়নামতিতে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ বিহার ও দর্শনীয় স্থানের মধ্যে শালবন মহাবিহার, আনন্দবিহার, ভোজবিহার, বৃক্ষবান বিহার, ইটাখোলা বিহার, কৌটিল্যমুড়া, কৌটিল্যামুড়া, চারপত্রমুড়া, ত্ৰিপত্রমুড়া উল্লেখযোগ্য। বগুড়া জেলায় আবিষ্কৃত বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থানের মধ্যে মহাস্থানগড়, ভাসুবিহার, গোবিন্দভিটা, বৈৰাগীৰ ভিটা অন্যতম। নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে সোমপুর মহাবিহারের ধ্বনসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি বাংলাদেশের আবিষ্কৃত সৰ্ববৃহৎ প্রাচীন বৌদ্ধবিহার। এছাড়া এ অঞ্চলে হলুদ বিহার, জগন্মল বিহারের ধ্বনসাবশেষ আছে। দিনাজপুরে সীতাকোট বিহারের ধ্বনসাবশেষ রয়েছে। সম্পত্তি নৰসিংহদী জেলায় উয়ারী-বটেশ্বর, পঞ্চগড়ে পদ্মবিহার, এবং মুক্তিগঞ্জ জেলার রঘুনাথপুরে বিরুমপুরী বিহারের ধ্বনসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলো আমাদের অতীত ঐতিহ্যের ঝারক। বাংলাদেশ সরকার এগুলো গুরুত্বের সঙ্গে সংরক্ষণ করছে। এসব বৌদ্ধ ঐতিহ্য দেখতে দেশ-বিদেশ থেকে বিশুদ্ধসংখ্যক পর্যটকের সমাগম হয়।

আধুনিককালে নির্মিত অপূৰ্ব সুন্দর বৌদ্ধবিহার ও বৃক্ষমূর্তি আছে, যেগুলো বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থান হিসেবে মৰ্যাদা লাভ কৰেছে। বৌদ্ধবিহারগুলোৰ মধ্যে পাহাড়তলীৰ মহামুনি বিহার, রাউজানেৰ সুদৰ্শন বিহার, বাগোয়ানেৰ ফৱাচিন বিহার, পটিয়াৰ সেবাসদন বিহার, ঠেগৱপুনিৰ বৃড়া গৌসাই বিহার, চকুশালা বিহার, রামুৱ রামকোট বিহার, কুৱাৰাজারেৰ অগ্ৰগমেধা বিহার, রাঙামাটিৰ চিত্মৱৰম বিহার, রাজবন বিহার, সীতাকুণ্ডেৰ সংজ্ঞারাম বিহার, খাগড়াছড়িৰ পানছড়িতে অবস্থিত অৱণ্য কৃষ্ণ বিহার, ঢাকাৰ ধৰ্মৱাজিক বৌদ্ধবিহার, বান্দৱানেৰ স্বৰ্ণ মণ্ডিৰ অত্যন্ত প্ৰসিদ্ধ। এসব বিহারে স্থাপিত বৃক্ষমূর্তি ও অন্যান্য

স্থাপনার নির্মাণশেলী খুবই চমৎকার। বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন কাহিনি বিহারের দেয়ালে অঙ্কিত আছে, যা আকর্ষণীয় এবং দর্শনীয় মনে ধর্মভাব জাগরত করে। দেড় শ বছর আগে ঠেঁগুরপুনি থামের পুরুরে একটি বৃক্ষমূর্তি পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, স্বর্ণমুদ্রার পাত্রসহ মূর্তিটি পুরুর থেকে উদ্ধার করার জন্য হারাধন বড়ুয়ার স্ত্রী নীলমণি বড়ুয়া স্বপ্নে আদেশপ্রাপ্ত হন। তাঁর স্বপ্নের বিবরণ অনুযায়ী স্বর্ণমুদ্রার পাত্রসহ মূর্তিটি উদ্ধার করা হয়। মূর্তিটি অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে জানা যায়। এই মূর্তির নিকট যদি কেউ কৃশলচিত্তে কোনো কিছু প্রার্থনা করে, তার সেই মনোবাসনা পূর্ণ হয়। অনুরূপভাবে চিমুরমের বৃক্ষমূর্তি, মহামুনি বৃক্ষমূর্তি, বাগোয়ানের ফরাচিন মূর্তি ও অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলে বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে। তাই অনেক ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ যেকোনো শুভকাজ আরম্ভ করার আগে এসব বিহারে গিয়ে শক্তি নিবেদন করে। বিহারগুলো মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত। এসব বিহার প্রাঙ্গণে বিভিন্ন পূর্ণিমা তিথিতে মেলা ও উৎসবের আয়োজন করা হয়। জাতি-ধর্মনির্বিশেষে এসব স্থানে বহু পর্যটকের সমাগম হয়। এগুলো ছাড়াও আরো অনেক বৌদ্ধবিহার, চৈত্য ও বৃক্ষমূর্তি আছে। এগুলো দেখতে খুবই সুন্দর।

অনুশীলনমূলক কাজ

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও দর্শনীয় স্থানসমূহের তালিকা তৈরি করো(দলীয় কাজ)।

আধুনিক কালের দশটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ বিহারের নাম শেখো।

পাঠ : ২

ময়নামতি

কুমিল্লা জেলার কেন্দ্রস্থল থেকে আট মাইল দূরে ময়নামতি অবস্থিত। ময়নামতি ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা এবং প্রায় এগারো মাইল বিস্তৃত। এই পাহাড়গুলো অতীতে বৌদ্ধবিহার, ও স্তুপ ইত্যাদিতে পূর্ণ ছিল। খননকার্যের ফলে এখানে অনেক প্রাচীন বৌদ্ধবিহার ও স্তুপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৪৩-৪৪ সালে এ সকল নির্দশন আবিষ্কৃত হয়। সে সময় এগুলো ঢিবি আকারে ছিল। স্থানীয় লোকেরা এসব ঢিবি থেকে ইট সঞ্চাহ করত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কুমিল্লা বিমানবন্দর তৈরির সময় ঠিকাদারাও এসব ঢিবি থেকে ইট সঞ্চাহ করত। ফলে অনেক মূল্যবান প্রত্নবস্তু নষ্ট ও হারিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে সরকার ২০টি নির্দশনকে প্রাচীন কীর্তি রক্ষা আইনে সংরক্ষিত করেছে। তার মধ্যে ময়নামতি অন্যতম। এখানে ১৯৫৫-৫৬ সালে খননকাজ চালানো হয়। অনেক প্রাচীন বৌদ্ধবিহার, স্তুপ, বৃক্ষমূর্তি, স্বর্ণ ও তাম্র মুদ্রা, মৃৎফলক, আসবাবপত্র এবং শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কৃত শিলালিপি হতে জানা যায় যে, এখানে পালবৎশ, খড়গবৎশ, চন্দ্ৰবৎশ, দেববৎশ প্রভৃতি বৎশের বৌদ্ধ রাজারা রাজাত্মক করতেন। এই বৌদ্ধ রাজবৎশের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ময়নামতি অঞ্চলে অনেক বৌদ্ধবিহার চৈত্য প্রভৃতি নির্মিত হয়। দ্বিতীয় সঙ্গম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ময়নামতি ছিল বৌদ্ধধর্মের প্রাণকেন্দ্র। বৌদ্ধ বিহারগুলো বিদ্যার্চার জন্যও প্রসিদ্ধ ছিল। এখানে বিদেশ থেকে পওতেরা বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা করতে আসতেন।

শালবন মহাবিহার

কুমিল্লার ময়নামতি অঞ্চলের সবচেয়ে বড় বৌদ্ধবিহার হলো শালবন মহাবিহার। খননকার্যের ফলে শালবন মহাবিহারের ধ্বংসস্তুপে একটি তাত্ত্বিলিপি পাওয়া যায়। সেই তাত্ত্বিলিপি হতে জানা যায় যে, শালবন মহাবিহারটি রাজা ভবদেব নির্মাণ করেছিলেন। তিনি ছিলেন দেববৎশের রাজা আনন্দদেবের পুত্র। অষ্টম শতাব্দীর দিকে দেববৎশ এ অঞ্চল শাসন করতেন। উক্ত বিহারের ধ্বংসাবশেষ হতে বোৱা যায়, বিহারটি ছিল বর্ণাকৃতির। প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য ৫৫০ ফুট। বিহারের চারদিক দেয়ালবেষ্টিত। দেয়ালের উচ্চতা সাড়ে ১৬ ফুট।



শালবন মহাবিহার

এই বিহারে ১১৫টি কক্ষ ছিল। সব কক্ষই সমান। কক্ষগুলোতে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বসবাস করতেন। একটি কক্ষ থেকে অপর কক্ষ ৫ ফুট পুরু দেয়াল দিয়ে পৃথক করা। উভয় দিকে একটি মাত্র প্রবেশপথ ছিল। বিহারে প্রবেশের সিঁড়িও উভয় দিকে ছিল। মূল বিহারটি ক্রুশ আকৃতির। এটি ইট নির্মিত এবং বিহার অঞ্চনের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এটি আয়তাকার। দৈর্ঘ্যে ১৬৮ ফুট, অস্ত্রে ১১০ ফুট। বিহারকে বেফন করে ৭ ফুট চওড়া প্রদক্ষিণ পথ রয়েছে। বিহার গাত্রের দেয়াল সারি সারি পোড়ামাটির ফঙ্কচিত্রে অঙ্কৃত ছিল।

বিহারাঙ্গনে আরো অনেক স্থাপত্যের নির্দর্শন আছে। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে স্তুতিবিশিষ্ট একটি হলঘর আছে। কেন্দ্রীয় বিহারের পশ্চিমে দুটি ছোট মন্দির আছে। বিহারের বাইরে উভয়-পশ্চিম কোণ থেকে ৬০ ফুট দূরে বর্ণাকৃতির একটি চার কোণাকার বিহার আছে। পূজাকক্ষ বিহারের মধ্যস্থলে অবস্থিত।

খননের ফলে এখানে বহু প্রত্নসম্পদ পাওয়া গেছে। তার মধ্যে চাটি তাত্ত্বিলিপি, স্বর্ণ, রৌপ্য মুদ্রা, অলংকার, ব্রাজের বৃদ্ধি, ও বোধিসত্ত্বমূর্তি, নানা দেব-দেবীর মূর্তি, পোড়ামাটির অসংখ্য ফলক, অলংকৃত ইট, প্রস্তরমূর্তি, তামার পাত্র এবং দৈনন্দিন ব্যবহার্য বিভিন্ন জিনিসপত্র উল্লেখযোগ্য। মূর্তিগুলো খুবই সুন্দর এবং মূল্যবান।

শালবন মহাবিহার ছিল বৌদ্ধধর্ম চর্চার আগকেন্দ্র। বৌদ্ধধর্ম ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় এই বিহারে শিক্ষা দেওয়া হতো। বিদ্যাপীঠ হিসেবে এ বিহারের খুব সুখ্যাতি ছিল। দেশ-বিদেশ থেকে পণ্ডিতেরা এখানে জ্ঞান অর্জনের জন্য আসতেন। দেববৎশ, চন্দ্রবৎশ ও পালবৎশের রাজারাও এই বিহারের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। বিহারটি চার শ' বছর টিকে ছিল।

অনুশীলনমূলক কাজ

ময়নামতি কোথায় অবস্থিত?

ময়নামতিতে কখন বৌদ্ধ নির্দর্শনগুলো আবিকৃত হয়েছিল?

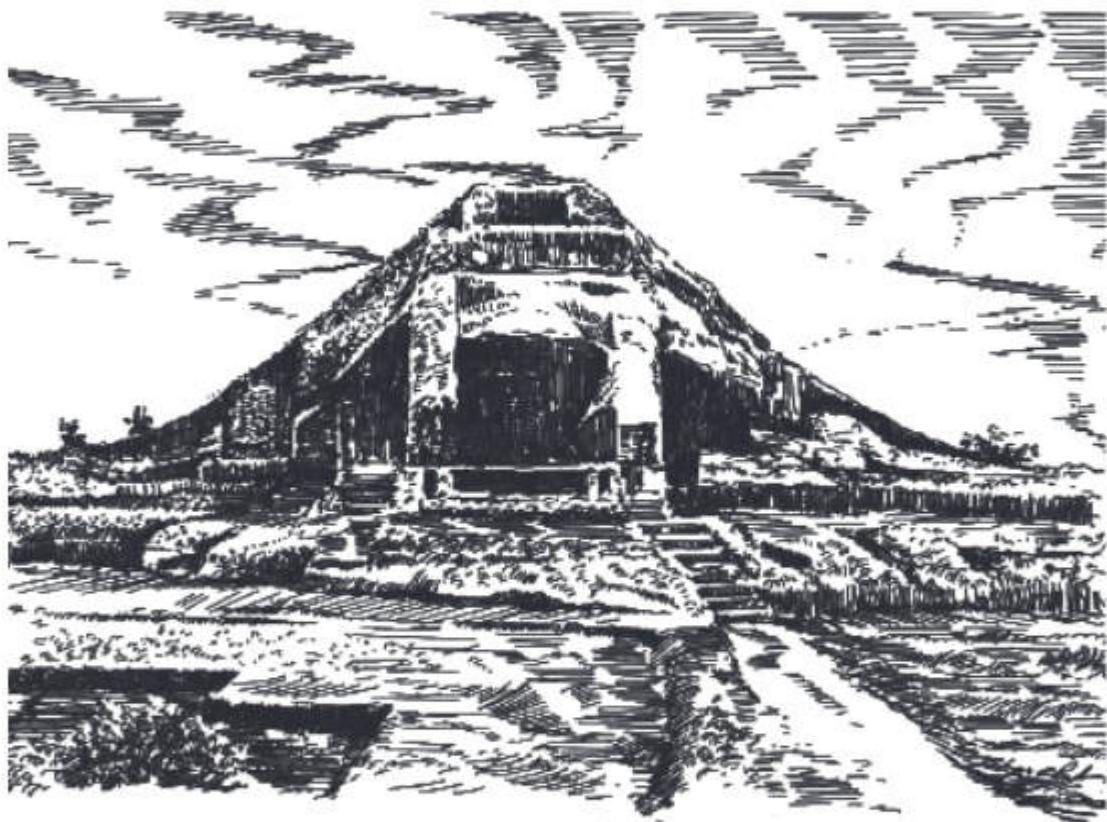
শালবন মহাবিহারে যেসব জিনিস আবিকৃত হয়েছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো।

শালবন মহাবিহারের একটি চিত্র অঙ্কন করো।

পাঠ : ৩

পাহাড়পুর

জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ রেলস্টেশন থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে নওগাঁর বদলগাছী থানায় পাহাড়পুর অবস্থিত। পাল বংশের রাজারা এই অঞ্চল শাসন করতেন। এ অঞ্চলটি বৌদ্ধ সভ্যতার আগকেন্দ্র ছিল। পাল বংশের রাজা ধর্মপাল এখানে একটি বৃহৎ বিহার নির্মাণ করেন। বিহারটির নাম ‘সোমপুর মহাবিহার।’ এটি ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম বৌদ্ধবিহার। এই বিহারের জন্য পাহাড়পুরের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। নিচে সোমপুর মহাবিহারের পরিচয় তুলে ধরা হলো।



সোমপুর মহাবিহার

সোমপুর মহাবিহার

খননকার্যের ফলে সোমপুর মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়। বিহারটি বর্ণাকৃতির। প্রায় ২৭ একর জমিজুড়ে বিহারটি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বিহারের আয়তন উত্তর-দক্ষিণে ৯২২ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৯১৯ ফুট। বিহারের চারদিক ইটের প্রকাণ্ড দেয়াল দিয়ে ঘেরা। বিশাল বিহারটি দুর্গের মতো দেখায়। এতে ভিজ্জনের বসবাসের জন্য ১৭৭টি কক্ষ ছিল। কক্ষগুলোতে কোনো জানালা ছিল না। তবে দেয়ালের মধ্যে কুলুঙ্গি ছিল। সব কঠি কক্ষ একই মাপের (14×13 ফুট)। প্রতিটি কক্ষে একটি প্রবেশপথ রয়েছে। বিহারাজানে অসংখ্য নিবেদন স্তূপ, ছেট ছেট মন্দির, পুষ্করিণী এবং অন্যান্য স্থাপনা ছড়িয়ে আছে। বিহারের কেন্দ্রস্থলে ক্রশ আকৃতির সুউচ্চ একটি মন্দির আছে। অন্ততাত্ত্বিক খননের ফলে এর ধ্বংসাবশেষ চিহ্নিত হয়েছে।

বিহারের প্রধান প্রবেশপথ উপর দিকে অবস্থিত। প্রবেশপথ ছিল বেশ বিশৃঙ্খল। বিহারের দেয়ালগাত্রে পোড়ামাটির অপূর্ব ফলক চিত্রে অলঙ্কৃত ছিল। সহজ-সরল গ্রামীণ শিল্পীরা মাটি দিয়ে এগুলো তৈরি করেছিল। এগুলো ছিল প্রাচীন বাংলার সমাজ চিত্র। এগুলোর শিল্পমান অনন্যসাধারণ।

রাজা ধৰ্মপাল এ বিহারকে কেন্দ্র করে আরও পঞ্চাশটি বৌদ্ধবিহার ও শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে জানা যায়। এই বিহারের ধৰ্মসাধনের থেকে খননকার্যের ফলে বহু বৃদ্ধি, বোধিসত্ত্ব ও বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি, মূদ্রা, শিলালিপি, তত্ত্ব নির্মিত দ্রব্য, আসবাবপত্র আবিষ্কৃত হয়।

মহাপণ্ডিত বৈধিক্ষণ্ণ ও অভীষ্ঠ দীপঙ্কর এ বিহারে অবস্থান করেন। পরে অভীষ্ঠ দীপঙ্কর তিব্বতে গিয়ে ধৰ্ম প্রচার এবং বহু গ্রন্থ রচনা করেন। এটি শুধু বৌদ্ধবিহারই ছিল না, বিদ্যাপীঠও ছিল। বৌদ্ধধর্ম ছাড়াও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া হতো। দেশি-বিদেশি পণ্ডিতগণ এই বিহারে বিদ্যাশিক্ষার জন্য আসতেন। বহির্বিশ্বেও এ বিহারের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ইউনেস্কো পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহারকে ‘বিশ্ব ঐতিহ্য’ হিসেবে স্বীকৃতি দান করেছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

সোমপুর মহাবিহার অঞ্চলে অবস্থিত স্থাপনাগুলোর তালিকা তৈরি করো। (দলীয় কাজ)।

সোমপুর মহাবিহারে প্রাঙ্গ দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত করো।

পাঠ : ৪

রামকোট বিহার

কঢ়াবাজার জেলার রামু উপজেলায় রামকোট বিহার অবস্থিত। চট্টগ্রাম-কঢ়াবাজার প্রধান সড়কের প্রায় দুই মাইল পূর্বে প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা বিহারটি দেখতে খুবই সুন্দর। বিহারের ফটকে ‘রাঙ্কুট বনাশ্রম বৌদ্ধবিহার’ লেখা রয়েছে। তবে স্থানীয়ভাবে এটিকে সবাই রামকোট বনাশ্রম নামেই জানে। পঞ্চিং গবেষক ও বিভিন্ন ইতিহাসবিদের মতে, এ বিহার সন্তাটি অশোকের সময়ে বা তার পরবর্তী কালে প্রতিষ্ঠিত।



রামকোট বিহারের প্রবেশপথ

সতেরোটি ছোট বড় পাহাড় দ্বারা অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে বিহারটি পরিবেষ্টিত। এখানে বিশিষ্টভাবে চারদিকে ছড়ানো বহু প্রাচীন ইটের টুকরো, বৃদ্ধমূর্তির ভগ্নাবশেষ, পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গেছে। বিহারটির চূড়ার উচ্চতা প্রায় ৪০ ফুট। এই অসাধারণ নির্মাণ কাজের জন্য বিহারটি অন্যতম বৌদ্ধ নিদর্শন হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। রামকোট বিহারের দক্ষিণ পাশের অন্য একটি ছোট পাহাড়ের সূপ থেকে একটি মূল্যবান শিলালিপি আবিষ্ট হয়। সেটি ডাকাত দল লুপ্তন করে নিয়ে যায়। স্থানীয় জনসাধারণের বর্ণনা থেকে জানা যায়, এই মূল্যবান শিলালিপিটি টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলা হয়েছে। সূপটিও সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়েছে। জানা যায়, ১৯৩০ সালে জগৎসন্দুর মহাথের নামে মিয়ানমারের (আগের বার্মা) এক ভিক্ষু শ্রীলংকায় একখনি শিলালিপি উদ্ধার করেন। সেই শিলালিপির বর্ণনা মতে এখানে অনুসন্ধান ও খননকার্য চালানো হয়। খননকাজের ফলে বৃহৎ সঙ্গারামটির ধ্বংসাবশেষ ও পাথরে নির্মিত সুদৃশ্য বৃহদাকার অভয়মূদ্রার একটি বৃদ্ধমূর্তি আবিষ্ট হয়। প্রাচীন এ বৃদ্ধমূর্তিটি এখনও রামকোট বিহারে সংরক্ষিত আছে। বিহারের চারপাশে প্রচুর পরিমাণে স্থানীয় বেলে পাথরে নির্মিত ভাস্করের ভগ্নাবশেষ পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে বুদ্ধের দুটি পদচিহ্ন (পূর্ণাকার) ও ভূমিস্পর্শ মুদ্রার বৃদ্ধমূর্তিটি অন্যতম।

বিহারটির দক্ষিণ-পূর্বদিকে সবচেয়ে মূল্যবান ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রত্নস্থলটি অবস্থিত। এ প্রত্নস্থলের কেন্দ্রস্থলটি আনুমানিক ৩০ ফুট উঁচু একটি টিলার ওপর অবস্থিত। গঠন প্রণালি বিবেচনা করে এটি একটি বিশাল সঙ্গারাম ছিল বলে ধারণা করা হয়। এই বিহারটি চট্টগ্রামের সঙ্গে আরাকান রাজ্যের সম্পর্ক ও সংস্কৃতি বিনিময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল।

বর্তমানে বিহারটিতে 'অরিয়ধর্ম' নামে একটি পাঠাগার আছে। গ্রন্থসংখ্যা ছয়শত অধিক। পাঠাগারটি সকলের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত।

এ প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ একটি রাম্যবতী নগরী ও বৌদ্ধধর্মের ঐতিহ্যময় গৌরবগাথার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্থানীয় ধর্মগ্রাণ জনসাধারণ বিহারস্থ ভিক্ষু ও শ্রমণদের ব্যয়ভার সানন্দে বহন করেন। বিহারে অবস্থিত বৃহৎ বৃদ্ধমূর্তিটি দর্শন করার জন্য দেশি-বিদেশি অনেক পর্যটক এখানে আসেন। খননকার্য চালানো হলে এখানে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রত্বন্তু আবিষ্কার হওয়ার সন্দেশ বনা রয়েছে।

অনুশীলনমূলক কাজ
রামকোট বিহার কোথায় অবস্থিত?
রামকোট বিহারের গঠনশৈলী বর্ণনা করো।

পাঠ : ৫

রাজবন বিহার

রাঞ্জামাটি পার্বত্য জেলা শহরের একটি প্রসিদ্ধ বিহার হলো রাজবন বিহার। এটি ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিহারটি অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত। বিহারের মনোরম এলাকায় পশুপাথি নির্ভয়ে বিচরণ ও চলাচল করে। শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির এই বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। গভীর অরণ্যে ভাবনা করায় তিনি 'বনভন্তে' নামেই অধিক পরিচিত। বাংলাদেশি বৌদ্ধরা তাঁকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করেন। বাংলাদেশি বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে তাঁর অনন্য ভূমিকা রয়েছে। তিনি চাকমা রাজপরিবার ও স্থানীয় নেতৃত্বন্দের আমন্ত্রণে ১৯৭৪ সালে রাঞ্জামাটি জেলার লংগদু থেকে এ বিহারে আগমন করেন। রাজপরিবার কর্তৃক দানকৃত জমিসহ রাজবন বিহারের মোট আয়তন ৪৭ একর। বিহারে উপাসনা মন্দির, চৈত্য, ভিক্ষুশালা, দেশনাঘর, চক্রমণ কুটির, ভিক্ষুসীমা, ভোজনালয়, পাঠাগার, জাদুঘর, বয়নশালা, ভিক্ষু উপগৃহের মূর্তি,



রাত্তামাটির রাজবন বিহার

সন্তুষ্টির প্রতীক, বৌধিবৃক্ষ প্রতৃতি রয়েছে। বিহারটির নির্মাণশেলী অপূর্ব। পার্বত্য চুট্টামে বন বিহারের ঘাটের অধিক শাখা আছে এবং বনভঙ্গের শিষ্য-প্রশিষ্যের সংখ্যা সহস্রাধিক। তাঁর শিষ্যমণ্ডলী ধৃতাঙ্গাশীল পালন করেন। বৌদ্ধদের নিকট এই বিহারটি তীর্থস্থান হিসেবে খ্যাত। এ তীর্থস্থানে প্রতিদিন জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বিপুলসংখ্যক পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে জনগণ এই বিহারে প্রবেশ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করতে আসেন। এছাড়া দূর দূরান্ত থেকে মানুষ এ বিহারে সন্তানের অন্তর্ধান, সজ্ঞাদান, অষ্টপরিক্ষার দান, কঠিন চীবরদান প্রতৃতি ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান করতে আসেন।

এ বিহারে পূর্ণিমা তিথিতে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জাঁকজমকপূর্ণভাবে বুদ্ধপূর্ণিমা, কঠিন চীবরদান এবং বনভঙ্গের জন্মদিন উদ্যাপন করা হয়। কঠিন চীবরদানের সময় চবিশ ঘন্টার মধ্যে তুলা থেকে সুতা কেটে, রং করে, কোমর তাঁতে বুলে, সেলাই করে চীবর তৈরি করা হয়। এই দৃশ্য খুবই

চমৎকার। চাকমা রাজমাতা বা চাকমা রানি দিনের শুরুতে সূতা কাটা উদ্বোধন করেন এবং দিনের শেষে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ধর্ম দেশনা প্রদানের পর চাকমা রাজা তৈরিকৃত চীবর দান করেন। এদিন প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটে। তখন বিহারটি একটি মিলনমেলায় পরিণত হয়। বনভঙ্গে এবং রাজবন বিহারের খ্যাতি দেশের সীমা অতিক্রম করে বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। দেশ-বিদেশ থেকে প্রচুর পর্যটক এবং ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধ জনসাধারণ রাজবন বিহার দর্শন করতে আসেন। বৌদ্ধ তীর্থস্থান হিসেবে এই বিহারের আন্তর্জাতিক খ্যাতি রয়েছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

রাজবন বিহার অঞ্চলে অবস্থিত স্থাপনাসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করো।
কঠিন চীবরদানের সময় রাজবন বিহারে কীভাবে চীবর তৈরি করা হয় তা বর্ণনা করো।

পাঠ : ৬

দর্শনীয় স্থান ভ্রমণের সুফল ও সংরক্ষণ

দর্শনীয় স্থান ভ্রমণের সুফল অনেক। দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করলে ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। মন উদার হয়। দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। সামাজিক সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় অনুভূতির বিকাশ ঘটে। দর্শনীয় স্থান ও ঐতিহ্য সম্পর্কে বাস্তব ধারণা সৃষ্টি হয়। দেশের সম্পদ ও ঐতিহ্য রক্ষায় প্রেরণা জাগে। তাই সময় পেলে মাতা-পিতা, ভাই-বোন, আত্মীয় স্বজন এবং শিক্ষকের সঙ্গে দর্শনীয় স্থানসমূহ ভ্রমণ করা উচিত। দর্শনীয় স্থানসমূহ জাতীয় সম্পদ। এগুলো দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য ধরে রাখে। বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরে। পর্যটনশিল্প হিসেবে রাজস্ব আয় করে। তাই দর্শনীয় স্থানসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। এগুলো সংরক্ষণ করার দায়িত্ব আমাদের স্বারূপ।

বিভিন্ন কারণে দর্শনীয় স্থানসমূহ ধ্বংস বা নষ্ট হতে পারে। যেমন: সংরক্ষণের অভাব, অযত্ন, নদীভাঙ্গন, বন্যা, ঝড়-বৃষ্টি, তুষান, পশু-পাখির মগ ত্যাগ, কীটপতঙ্গের উপদ্রব, অপ্রয়োজনীয় লতা-পাতা, গাছ পালা জন্মে বা উদ্ভিদজাত সংক্রমণ, বায়ুদূষণ, অজ্ঞ মানুষের অহেতুক কৌতুহল, লুটেরাদের দৌরাত্য, যুদ্ধবিঘ্ন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রভৃতি কারণে দর্শনীয় স্থানগুলো ধ্বংস বা নষ্ট হতে পারে। তাই উপরে বর্ণিত কারণে যাতে দর্শনীয় স্থানগুলোর ক্ষতি না হয়, সে জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে সতর্ক থাকতে হবে। দর্শনীয় স্থানের চারদিক প্রাচীর দিয়ে ধিরে দিতে হবে। দেখাশোনার ব্যবস্থা করতে হবে। সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। এ-জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ করার জন্য সর্ব-সাধারণকে সচেতন ও উদ্বৃদ্ধ করতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারের অঞ্চলী ভূমিকা থাকা দরকার।

অনুশীলনমূলক কাজ

দর্শনীয় স্থান ভ্রমণের সুফলগুলো লেখো।
দর্শনীয় স্থান ধ্বংসের কারণগুলো লিপিবদ্ধ করো।
দর্শনীয় স্থান সংরক্ষণের উপায় বর্ণনা করো।

অনুশীলনী

শূন্যস্থান পূরণ করো

১. বাংলাদেশে খৃচুর বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও ----- স্থান আছে।
২. বিহারগুলো মনোরম ----- পরিবেশে অবস্থিত।
৩. শালবন মহাবিহার ছিল বৌদ্ধধর্ম চর্চার -----।
৪. কক্ষবাজার জেলার রামু উপজেলায়----- বিহার অবস্থিত।
৫. ----- সালে রাঙামাটি শহরে রাজবন বিহার স্থাপিত হয়।

মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে	পোড়ামাটির ফলকচিত্রে অলঙ্কৃত ছিল।
২. বিহারের দেয়ালগাত্র অপূর্ব	এখানে একটি বৃহৎ বিহার নির্মাণ করেন।
৩. পাল বংশের রাজা ধর্মপাল	চাকমা রাজা চীবরদান করেন।
৪. বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ধর্ম দেশনা প্রদানের পর	সোমপুর মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের ঔপনিষথ বৌদ্ধ বিহারগুলোর নাম লেখো।
২. সোমপুর মহাবিহারের প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দর্শন সম্পর্কে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।
৩. শালবন মহাবিহারে আবিস্কৃত তাত্ত্বিকিপ ও ধ্বংসাবশেষ থেকে কী কী ধারণা পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা করো।
৪. রামকোট বিহারের শিলালিপি সম্পর্কে ধারণা দাও।
৫. রাজবন বিহারে কী কী অনুষ্ঠান পালন করা হয়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. দর্শনীয় স্থান হিসেবে যয়নামতি সম্পর্কে বর্ণনা দাও।
২. কঠিন চীবরদান কী? একটি কঠিন চীবরদান অনুষ্ঠানের বর্ণনা দাও।
৩. পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহারকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে সীকৃতি দেওয়ার কারণ কী? ব্যাখ্যা করো।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সোমপুর মহাবিহারে ভিক্ষুদের বসবাসের জন্য কয়টি কক্ষ ছিল?

- | | |
|--------|--------|
| ক. ১১০ | খ. ১১৫ |
| গ. ১৬৮ | ঘ. ১৭৭ |

২. ময়নামতি বিখ্যাত হওয়ার অন্যতম কারণ কোনটি?

- | |
|-------------------------------------|
| ক. বৌদ্ধ নির্দশন আবিষ্ট হওয়ায় |
| খ. শালবন মহাবিহারের সৌন্দর্যের জন্য |
| গ. তীর্থস্থান হিসেবে পরিচিতির জন্য |
| ঘ. ধর্মচর্চার কেন্দ্রের জন্য |

নিচের অনুচ্ছেটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

কল্যাণ মিত্র চৌধুরী পার্বত্যাঙ্গলের একটি বিহার দর্শনের জন্য যান। বিহারটির নির্মাণশৈলী তাঁকে মুগ্ধ করে। তিনি আরও মুগ্ধ হন উক্ত বিহারের পাঠাগার, বোধিবৃক্ষ, বয়নশালা ও উপাসনালয় দর্শন করে। তিনি আরও জানতে পারেন, উক্ত বিহারটি বৌদ্ধদের নিকট পৃণ্যতীর্থ হিসেবে পরিচিত।

৩. কল্যাণ মিত্র চৌধুরীর দর্শনীয় বিহারটি কোন বিহারের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে?

- | | |
|----------------|---------------|
| ক. আনন্দ বিহার | খ. মেঝী বিহার |
| গ. রাজবন বিহার | ঘ. রাজবিহার |

৪. বৌদ্ধধর্মে উক্ত বিহারের গুরুত্ব রয়েছে—

- i. দেশে-বিদেশে সুখ্যাতির কারণে
- ii. প্রাচীন ধর্মসম্বন্ধ থাকার কারণে
- iii. অন্যতম তীর্থস্থান হওয়ার কারণে

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. জগন্মঙ্গল বৌদ্ধবিহারের উপাসক-উপাসিকারা সম্মিলিতভাবে বাংলাদেশের প্রসিদ্ধ স্থান দর্শনের সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্তগ্রন্থে তাঁরা নির্ধারিত সময়ে একটি বিহার দর্শনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সেখানে পৌছে বিহারটির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পান। তাঁরা আরো লক্ষ্য করেন বিহারটিতে ১১৫টি কক্ষ রয়েছে। প্রতিটি কক্ষ পুরু দেয়ালে পৃথক রয়েছে। এছাড়া বিহারের গাত্রের দেয়াল সারি সারি পোড়ামাটির চিঠে অলঙ্কৃত। উক্ত বিহার দর্শন করে সবাই মুগ্ধ হলেন।

- ক. পাল বংশের কোন রাজা সোমপুর মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেন?
- খ. দর্শনীয় স্থানসমূহ প্রমাণ করা উচিত কেন?
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত উপাসক-উপাসিকারা কোন ঐতিহাসিক স্থান দর্শন করেছেন? বর্ণনা করো।
- ঘ. 'দর্শনীয় স্থানটি বৌদ্ধধর্মের ঐতিহ্যকে ধারণ করে আছে'—পাঠ্যপুস্তকের সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের আলোকে বিশ্লেষণ করো।

২.

ঘটনা-১

দিলীপ মুঢ়সুন্দি স্বদেশে ফিরে এসে রাঙামাটি বৌদ্ধবিহারে অষ্টপরিকার দান করার ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি বিহারে উপস্থিত হয়ে যথাসময়ে দানকার্য সম্পাদন করন। তিনি ঘুরে ঘুরে উক্ত বিহারে বয়নশালা, ভোজনালয়, ভিঙ্গু উপগুণ্ঠের মূর্তি, সঙ্গৰ্ভের প্রতীক, বোধিবৃক্ষ ইত্যাদি দর্শন করেন।

ঘটনা-২

ক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে মিতায়ন চাকমা কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতে বেড়াতে যান। তাঁরা কক্সবাজার প্রধান সড়কের প্রায় দু'মাইল পূর্বে প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে অবস্থিত একটি বিহারে যান। উক্ত বিহারটি সতেরোটি ছোট-বড় পাহাড় দ্বারা অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে পরিবেষ্টিত।

- ক. পাহাড়পুর কোন জেলায় অবস্থিত?
- খ. দর্শনীয় স্থান সংরক্ষণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো।
- গ. ঘটনা-১-এর সাথে কোন বিহারটির সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা করো।
- ঘ. ঘটনা-২ রামকোট বিহারের প্রতিচ্ছবি বিশ্লেষণ করো।

বৌদ্ধধর্মে রাজন্যবর্গের অবদান : রাজা বিষিসার

বুদ্ধের সময়কালে প্রাচীন ভারতবর্ষ ছোট ছোট ঘোলটি রাজ্য বিভক্ত ছিল। রাজ্যের রাজারা ছিলেন অনেক ক্ষমতাধর। রাজার ইচ্ছাতেই রাজ্যের সব কাজ পরিচালিত হতো। এ রাজাদের অনেকের সাথে গৌতম বুদ্ধের অত্যন্ত সুসম্পর্ক ছিল। এ সময় অনেক রাজা বুদ্ধের বাণ ও উপদেশ গ্রহণ করে রাজ্যে অগ্রয়োজনে প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন। এমনকি পূজা বা ঘোরের নামেও পশু হত্যা অনেক রাজ্য নিষিদ্ধ ছিল। জনকল্যাণে দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ হতে বুদ্ধ রাজাদের উপদেশ দিতেন। অনেক রাজা বুদ্ধের গৃহী শিষ্য বা উপাসক ছিলেন।

এ রাজাদের অনেকেই গৌতম বুদ্ধের ধর্ম প্রচার ও প্রসারে নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এটি রাজন্যবর্গের অবদান নামে স্বীকৃত। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মগধের রাজা বিষিসার। বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে তাঁর অবদান শ্রদ্ধাচিত্তে স্ফরণযোগ্য। এ অধ্যায়ে আমরা রাজা বিষিসার সম্পর্কে পড়ব। এ অধ্যায় শেষে আমরা—

- * রাজা বিষিসারের পরিচয় বর্ণনা করতে পারব;
- * বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসারে রাজা বিষিসারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।

পাঠ : ১

রাজা বিষিসার

বিষিসার ছিলেন মগধ রাজ্যের বিখ্যাত রাজা। গৌতম বুদ্ধের সময়ে যে ঘোলটি জনপদ বা রাজ্যের কথা জানা যায়, তার মধ্যে মগধ খুবই শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। মগধের রাজধানী ছিল রাজগৃহ। বর্তমানকালের ভারতের বিহার রাজ্যই ছিল মগধ রাজ্য। এই রাজ্যের মাটি উর্বর ছিল এবং প্রচুর ফসল হতো। এ রাজ্যের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে হিরণ্যবর্তী বা শোন নন্দী।

বিষিসার ছিলেন হর্ষক বংশের খ্যাতিমান নৃপতি। তাঁর নামের সাথে ‘শেণিয়’ বা ‘শ্রেণিক’ বিশেষণ যুক্ত হয়ে তিনি ‘মগধরাজ শ্রেণিক বিষিসার’ নামে খ্যাত ছিলেন। এটি ছিল তাঁর বংশের উপাধিবিশেষ। রাজা বিষিসারের রাজ্যাভিষেকের সৰ্ত্তক সময় জানা যায় না। ধারণা করা হয় যে, গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের আনুমানিক ষাট বছর আগে তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। বিষিসারের রাজত্বকাল থেকেই মগধের অগ্রগতির ইতিহাস শুরু হয়েছিল।

বিষিসারের জীবনকথা

বিষিসারের পিতার নাম ছিল ভট্টিয় বা মহাপদ্ম। অজ্ঞারাজ্যের রাজা ব্রহ্মদত্ত একদা বিষিসারের পিতা রাজা মহাপদ্মকে পরাজিত করেছিলেন। বিষিসার পনেরো বছর বয়সে রাজা হন। রাজা হয়ে তিনি রাজা ব্রহ্মদত্তকে পরাজিত করে অজ্ঞারাজ্য দখল করে নেন। তার পর থেকে মগধ রাজ্যের ভিত্তি সুস্থিত হয়। রাজা বিষিসার অত্যন্ত প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। যুদ্ধবিদ্যায় তাঁর সৈন্যবাহিনী খুব পারদর্শী ছিল। যুদ্ধে তিনি হাতি ব্যবহার করতেন। ফলে তিনি সহজেই যুদ্ধে জয়লাভ করতেন। তাঁর রাজ্যসীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জানা যায়, তাঁর রাজ্যে আশি হাজার শহর ছিল। শহরগুলোর মধ্যে তিনি সুন্দর যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। কোশল রাজ্যের রাজকুমারীর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। তিনি কোশল, বৈশালী, গান্ধার, অবণ্ডী প্রভৃতি রাজ্যের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করেন। রাজা বিষিসার প্রাচীন রাজগৃহ নগরী নির্মাণ করেছিলেন। রাজগৃহ পাঁচটি পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এখানে ছিল তাঁর রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদের চারদিক পাথরের প্রাচীর দ্বারা ঘেরা ছিল। রাজগৃহে বুদ্ধ অনেক দিন বসবাস করেছিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ অনেক ধর্মোপদেশ দান করেছিলেন। এখানে প্রথম ত্রিপিটক সংকলিত হয়েছিল। এ নগরীর ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। রাজগৃহের নিকটেই অবস্থিত ছিল নালন্দা।

রাজা বিষিসার সুশাসক ছিলেন। তিনি ন্যায়ের সঙ্গে রাজ্য শাসন করতেন। প্রজাদের খুব ভালোবাসতেন। সব সময় প্রজাদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করতেন। বিষিসারের জীবিতকালেই তাঁর পুত্র অজাতশত্রু রাজা হন। পরে দেবদণ্ডের প্ররোচনায় অজাতশত্রু পিতৃবিরোধী হয়ে উঠেন। একসময় তিনি পিতাকে কারাবন্দু
করেন। তাঁকে খাবার দেওয়া বন্ধ করে দেন। বিষিসার কারাগারে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল
পঁয়ষষ্ঠি বছর।

রাজা বিষিসার অন্য রাজ্যের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন শান্তিপ্রিয়
রাজা ও উন্নত সংগঠক। পার্শ্ববর্তী অন্য রাজ্যের রাজারাও তাঁর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে
এসেছিলেন। গান্ধারের রাজা পুকুরসাতি তাঁর কাছে দৃত পাঠিয়েছিলেন। অবস্থারাজ প্রদেয়াতের
চিকিৎসার জন্য তিনি তাঁর চিকিৎসক জীবককে প্রেরণ করেছিলেন। জীবক ছিলেন তদানীন্তন ভারতবর্ষের
একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক।

রাজা বিষিসারের রাজ্যে জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম উভয়েই সমসাময়িককালে বিকাশ লাভ করেছিল। মহাবীর
জৈন, গৌতমবুদ্ধ এবং রাজা বিষিসার প্রায় সমকালীন ব্যক্তিত্ব। রাজা বিষিসার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেও
জৈনধর্মসহ সে সময়ে প্রচলিত অন্যান্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। তিনি নিয়মিত রাজ্য পরিদর্শন
করতেন। গ্রামের শাসক গ্রামিকদের সাথে তিনি সব সময় মতবিনিময় করতেন। কথিত আছে, তিনি
আশি হাজার গ্রামিকের ওপর ভিত্তি করে রাজ্য পরিচালনা করতেন। রাজ্যের রাঙ্গা ঘাট ও বাঁধ নির্মাণ এবং
সেবামূলক প্রতিষ্ঠান তৈরিতে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

অনুশীলনমূলক কাজ
বিষিসারের জীবনকাহিনি লেখো।

পাঠ : ২

বুদ্ধ ও রাজা বিষিসার

বুদ্ধত্ব লাভের আগেই রাজা বিষিসারের সাথে বুদ্ধের সাক্ষাত হয়। তিনি রাজপ্রাসাদ ছেড়ে বৌধিজ্ঞান
লাভের জন্য উপযুক্ত গুরুর সন্ধান করছিলেন। রাজপ্রাসাদ ছেড়ে প্রথমে তিনি অনুপ্রিয় নামক আমবাগানে
পৌছান। সেখানে তিনি মস্তক মুগ্ধলি করেন। তারপর কাষায়া বন্ধ পরিধান করে সন্ধ্যাস ব্রত ধারণ করেন। এ
সময় তিনি ভিক্ষান্নে জীবন ধারণের সিদ্ধান্ত নেন। পায়ে হেঁটে তিনি এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে
যেতেন। এভাবে তিনি বৈশালী থেকে রাজগ্রহে পৌছান। উপযুক্ত গুরুর সন্ধান ও ভিক্ষান্ন সংগ্রহই ছিল তাঁর
লক্ষ্য। সৌম্য-শান্ত অপূর্ব সুন্দর এক যুবক ভিক্ষা করছেন। রাজগ্রহের নগররক্ষীরা তাঁকে দেখে অবাক হন।
এ খবর তাঁর পৌছে দেন রাজা বিষিসারের কাছে। রাজ প্রাসাদ থেকেই রাজা বিষিসার তাঁকে দেখতে
পান। রাজা নিজে এসে তাঁর সাথে দেখা করে ভিক্ষা করার কারণ জানতে চাইলেন। রাজা তাঁকে এই
কঠিন ব্রত ছেড়ে রাজসুখ ভোগ করার আহ্বান জানান। সেনাপতির পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন।
তখন সিদ্ধার্থ রাজা বিষিসারকে বলেন, ‘মহারাজ! আমি সুখপ্রাপ্তি নই। আমি কপিলাবস্তুর রাজা
শুদ্ধেদনের পুত্র। বুদ্ধত্ব লাভের আশায় আমি সবকিছু ত্যাগ করে সন্ধ্যাস্বরূপ গ্রহণ করেছি।’ রাজা বলেন,
‘বৎস! আপনার পিতা আমার পরম মিত্র। আপনার উদ্দেশ্য জেনে আমি খুব খুশ হয়েছি। যদি আপনি
বুদ্ধত্ব লাভ করেন, আমাকে একবার দর্শন দেবেন। আমি আপনার সেবা করব, আপনাকে বন্দনা করব।’
রাজা বিষিসারের কথায় সিদ্ধার্থ সম্মতি প্রদান করে সেখান থেকে বের হয়ে যান।

রাজা বিষিসারের সঙ্গে বুদ্ধের আবার দেখা হয় বুদ্ধত্ব লাভের পর। তখন বুদ্ধ রাজগ্রহের লটাঠি বন উদ্যানে
বসবাস করছিলেন। তার দুই বছর আগেই তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। লোকমুখে তাঁর যশ-খ্যাতির কথা শুনে
রাজা বিষিসার তাঁর সাথে দেখা করেন। বিষিসার ভগবান বুদ্ধের কাছে নতুন ধর্মের বাণী শোনার প্রার্থনা
করেন। বুদ্ধ তাঁকে দান, শীল ও স্বর্গ সমবেক্ষে সরলভাবে ধর্মোপদেশ দান করেন। তারপর, চতুর্বার্য সত্য,
আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্পর্কে উপদেশ দেন।

রাজা বিহিসার বুদ্ধের বাণী ও উপদেশ শুনে মুগ্ধ হন। তিনি বুদ্ধের গৃহী শিয়া বা উপাসক হন। এ সময় রাজা বিহিসারের বয়স হয়েছিল উনত্রিশ বছর। সে সময় রাজা বিহিসার ভিক্ষুসংখ্যার বুদ্ধকে রাজপ্রাসাদে নিমজ্ঞন গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। বুদ্ধ নিমজ্ঞন গ্রহণ করে প্রাসাদে গিয়ে রাজাকে নানা ধর্মকথা শোনান। রাজা ধর্মকথা শুনে আনন্দচিত্তে বুদ্ধকে বললেন, ‘গুড়! ছোটকালে আমার পাঁচটি কামনা ছিল। তা আজ পূর্ণ হলো।’ কামনাগুলো হলো :

১. আমি ভবিষ্যতে রাজপদে অভিষিক্ত হব।
২. আমার রাজ্য অর্হৎ সম্যকসমুদ্ধ অবতীর্ণ হবেন।
৩. আমি সেই বুদ্ধকে সেবা ও পরিচর্যা করব।
৪. সেই ভগবান বুদ্ধ আমাকে ধর্মোপাদেশ দান করবেন।
৫. আমি বুদ্ধের ধর্ম উপলব্ধি করব।

তারপর রাজা বিহিসার অত্যন্ত শ্রদ্ধাচিত্তে তাঁর রাজ্যের অতি মনোরম বেনুবন উদ্যান বুদ্ধ এবং তাঁর ভিক্ষুসংখ্যকে দান করেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

বিহিসারের সঙ্গে বুদ্ধের কথন এবং কীভাবে সাক্ষাৎ হয়?

রাজা বিহিসারের কামনাগুলো লেখো (দলীয় কাজ)।

পাঠ : ৩

বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারে বিহিসারের অবদান

বুদ্ধের উপাসক হওয়ার পর থেকে রাজা বিহিসার নানাভাবে বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে সহযোগিতা করতে থাকেন। তিনি ছত্রিশ বছর বুদ্ধ ও তাঁর ধর্মের সেবা করেন। তিনি মগধের অধিবাসীদের ধর্ম দেশনা করার জন্য বুদ্ধকে অনুরোধ করেন। বুদ্ধ তাঁর অনুরোধে মগধবাসীর উদ্দেশে ধর্ম দেশনা করেন। সেই সময় থেকে ভিক্ষুসংখ্য কর্তৃক গৃহীদের পঞ্চশীল ও অফ্টশীল দেওয়ার প্রচলন শুরু হয়।

এ সময় বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের পরিব্রাজকগণ পূর্ণিমা, অষ্টমী ও অমাবস্যা তিথিতে সমবেতভাবে ধর্ম আলোচনা করতেন। সাধারণ লোকেরা তাঁদের নিকট ধর্মকথা শুনতেন। তাঁদের ধর্মে দীক্ষা নিতেন। রাজা বিহিসার এসব লক্ষ্য করে ভিক্ষুদেরও ঐ সব তিথিতে ধর্ম আলোচনার সুযোগ দিতে বুদ্ধকে অনুরোধ করেন। বুদ্ধ তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেন। বুদ্ধ ভিক্ষুদের উপোসথ পালন ও ধর্ম আলোচনার নির্দেশ দেন। রাজা বিহিসারের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন জীবক। তিনি খুবই বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। রাজার আদেশে তিনি বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্গের চিকিৎসা করতেন। তাঁদের স্বাস্থ্য পরিচর্যার বিষয়ে তিনি সর্বদা সচেতন থাকতেন।

ভিক্ষুরা আগে পুরাতন ও পরিত্যক্ত কাপড় ধুয়ে শুকিয়ে সেলাই করে পরিধান করতেন। এতে ভিক্ষুদের অনেক রকম রোগ হতো। চিকিৎসক জীবক ভিক্ষুদের নীরোগ জীবন চিন্তা করেন এবং নতুন কাপড় পরিধানের অনুমতি প্রদানের জন্য বুদ্ধকে অনুরোধ করেন। বুদ্ধ জীবকের আবেদন মঞ্জুর করে ভিক্ষুদের নতুন কাপড় পরিধানের বিধান দিয়েছিলেন। এর পর থেকে রাজা বিহিসার ও ভিক্ষুদের নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নতুন কাপড় দান করতেন। এভাবে রাজা বিহিসার বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে অবদান রাখেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে রাজা বিহিসার বুদ্ধকে কী কী অনুরোধ করেছিলেন?

অনুশীলনী

শূন্যস্থান প্ররূপ করো

১. বৃন্দব জনকল্যাণে দায়িত্বশীল হতে উপদেশ দিতেন।
২. ছিলেন মগধ রাজ্যের বিখ্যাত রাজা।
৩. বিদ্বিসারের পিতার নাম বা।
৪. রাজগৃহের অন্দরে অবস্থিত।
৫. বিদ্বিসারের জীবিতকালেই তাঁর পুত্র রাজা হন।

মিলকরণ

বাম পাশ	ডান পাশ
১. বিদ্বিসারের রাজত্বকাল থেকেই	ভিষ্ণুদের নীরোগ জীবন চিন্তা করেন।
২. গ্রামের শাসক গ্রামিকদের সাথে	তিনি সব সময় মতবিনিময় করতেন।
৩. রাজগৃহ	মগধের অগ্রগতির ইতিহাস শুরু হয়েছিল।
৪. রাজা বিদ্বিসার বুন্দের	বাণী ও উপদেশ শুনে মৃগ হন।
৫. চিকিৎসক জীবক	পাঁচটি পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত ছিল।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বিদ্বিসার কে ছিলেন?
২. জীবক কে ছিলেন?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. রাজা বিদ্বিসারের জীবনী সংক্ষেপে আলোচনা করো।
২. রাজা বিদ্বিসার কীভাবে বুন্দের অনুরাগী হয়েছিলেন বর্ণনা করো।
৩. বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসারে রাজা বিদ্বিসারের অবদান ব্যাখ্যা করো।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. জীবক কোন রাজার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন?

ক. শুন্দেবদন	খ. অশোক
গ. বিদ্বিসার	ঘ. অজাতশত্ৰু
২. রাজা বিদ্বিসার সুশাসক হওয়ার কারণ, তিনি—
 - i. প্রজাদের ভালোবাসতেন
 - ii. ন্যায়ের সঙ্গে রাজ্য শাসন করতেন
 - iii. যুদ্ধের কৌশল জানতেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

কানাইমাদারী গ্রামের উপাসিকা পুল্পরানি বড়ুয়া নিজ গ্রামে একটি বিহার নির্মাণ করেন। বিহারটি তিনি ভিক্ষুসংখের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দান করার সিদ্ধান্ত নেন। এ উপলক্ষে ঐ গ্রামে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে শ্রদ্ধেয় ভক্তে দেশনাকালে ঐতিহাসিক বেনুবন উদ্যান দানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, এ ধরনের কাজ সম্বর্ধ উন্নয়নে ভূমিকা রাখে।

৩. পুল্পরানি বড়ুয়ার কর্মটি ধর্মীয় দৃষ্টিতে বলা যায়—

i. ধর্ম প্রচার ও প্রসারে অবদান

ii. ভিক্ষুসংখের সেবা দান

iii. পুণ্যাংশ অর্জন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

৪. পুল্পরানি বড়ুয়ার কর্মে বিদ্বিসারের কোন চেতনা প্রেরণা জুগিয়েছে?

ক. শ্রদ্ধা চিন্তের

খ. আন্তরিকতার

গ. সেবা করার

ঘ. খ্যাতি অর্জনের

সূজনশীল প্রশ্ন

‘নিখুম্পুর শহরের রঞ্জীরা মেয়ারকে গিয়ে বললেন, গভীর বনে জনেক সৌম্য, শান্ত ও সুন্দর শ্রমণ ভাবনা করছেন। মেয়ার উক্ত ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর আসার উদ্দেশ্য জানতে চান। উত্তরে তিনি বললেন, সংসার-দুঃখ থেকে মুক্তির আশায় এ পথ বেছে নিয়েছেন। বিষয়টি জেনে মেয়ার খুব খুশি হলেন। পরবর্তী সময়ে উক্ত শ্রমণের যেন কোনো ধরনের অসুবিধা না হয়; মেয়ার সেদিকে নজর রাখতেন। শ্রমণ যখন মার্গফল লাভ করলেন, তখন বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে মেয়ার বিহার নির্মাণ করে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দেন।’

ক. বিদ্বিসার কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন?

খ. সিদ্ধার্থ ও রাজা বিদ্বিসারের মধ্যে প্রথম সাক্ষাতে কী আলোচনা হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো।

গ. উক্তীপকে বর্ণিত ঘটনায় রাজা বিদ্বিসারের জীবনের কোন দিক তুলে ধরা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. মেয়ারের মতো ব্যক্তিরা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন, তোমার পাঠ্য বইয়ের আলোকে মতামত দাও।

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

ষষ্ঠি-বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা

সকল প্রাণী সুখী হোক।

- গৌতম বুদ্ধ



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।